শিরীষ ফুল

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

জয়শ্রী পুস্তকালয়
১৬৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

জয়শ্রী গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ
১৬৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৪৭
দাম—পাঁচসিকা

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাকার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

দুটী-কথা

এই বইখানির গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"সোহাগী" আমার প্রথম গল্প এবং ইহার সম্বন্ধে ছোট্ট একটী ইতিহাস আছে। এই গল্পটী প্রকাশিত হইবার অত্যল্পকাল পরে আমি নাগপুরের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য সেবকের নিকট হইতে একখানি দীর্ঘ পত্র পাই, তাহাতে তিনি গল্পটীর নানাবিধ প্রশংসা করিয়া, ইহা মহারাষ্ট্র ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য আমার নিকট হইতে অনুমতি চাহিয়া পাঠান। বলা বাহুল্য, গল্প লিখিয়া যে আত্মপ্রসাদের আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, এই পত্রখানি পড়িয়া সে আনন্দ আরও নিবিড়তর হইয়া উঠে। তাই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সেই সাহিত্য-রসিক বন্ধুটীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে যাঁহারা আমায় সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমি ব্যক্তিগত ভাবে ঋণী, বিশেষ করিয়া বাংলার সর্ব্বজন-প্রিয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

সংস্কার

মিঃ এন, চাটার্জ্জি একেবারে আনকোরা আই, সি, এস, এখনও বছর পার হয় নাই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাকরীতে বহাল হইয়াছেন।

সেটেলমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষে আজ প্রাতে সদর হইতে এখানে আসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি স্থানীয় ডাক্-বাংলোয় সপরিবারে ক্যাম্প করিয়াছেন। জায়গাটা একেবারে অজ পাড়াগাঁ। এখানে তাঁকে পাঁচ সাত দিন থাকিতে হইবে বোধ হয়।

বাংলোর বারান্দায় বসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপে মগ্ন। কাল—রাত্রি, দূরে নীলাকাশের নির্জ্জন পটভূমিকায় দেবীপক্ষের চাঁদ মৃদু গতিতে হাল্কা মেঘে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রে ডিনারের পর দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করা তাঁহাদের নিত্যকারের অভ্যাস।

কথায় কথায় মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন "এই সব মাঠঘাট বনবাদাড়ই হ'ল বাংলাদেশের প্রাণ।"

মিঃ চাটার্জ্জি তাঁর মুখের পাইপটা হইতে ইঞ্জিনের মত একরাশ ধোঁয়া উডাইয়া মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ অন্ততঃ চলন্ত ট্রেনে বসে তাই ভাবা উচিত।"

হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "না ঠাট্টা নয়, দেখ দেখি, চারদিকে কেমন একটা সহজ স্বচ্ছন্দতা, আকাশে কি চমৎকার জ্যোৎস্না, আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগছে।" এই বলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি এক সুকুমার ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকাইয়া স্বামীর দিকে তাকাইলেন।

মিঃ চাটার্জ্জি নিজের চেয়ারখানাকে স্ত্রীর আরও নিকটে লইয়া তাঁর স্কন্ধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমারও লাগছে মন্দ নয়, তবে তার চেয়েও কি ভাল লাগছে জান রাণী ?"

মিসেস চাটার্জ্জির পুরা নাম ইলারাণী। তাঁর অপরাপর আত্মীয়স্বজন তাঁকে ইলা বলিয়া ডাকেন। কেবল মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীকে আদর করিয়া ডাকেন "রাণী"। মিসেস চাটার্জ্জি যেন স্বামীর বক্তব্যের ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমার ও ত' গতানুগতিক ভাল লাগা, ওর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে ?"

"না, আজ বিশেষ ভাল লাগছে এই জ্যোৎস্নার আলোর জন্য। আজ তুমি কাছে বসে একটির পর একটি গান গাইবে, আর আমি মুখোমুখি হ'য়ে তা শুনব।" এই বলিয়া মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর কাঁধের উপর হাত রাখিলেন।

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন "কিন্তু তা যে হবার উপায় নেই; অর্গ্যান না হলে আমি মোটেই গাইতে পারি না। তার চেয়ে চল নদীর ধারে খানিকটা হাত ধরাধরি করে বেড়িয়ে আসা যাক, কেমন ?"

বিস্মিত স্বরে মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন "নদী ? নদী কোথায়, ও ত একটা শুকনো খাল।" মিসেস চাটার্জ্জি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, খাল নয়—সরস্বতী নদী। ছেলেবেলায় দিদিমার মুখে গল্প শুনেছি, এই সরস্বতীর বুকের উপর দিয়েই বেহুলা দেবী মরা স্বামী লখিন্দরকে কোলে করে ভেসে বেড়িয়েছিলেন।"

বেড়াইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "বেশ, বেশ। তুমি ত' দেখছি এ সব জান, একেবারে মেম সাহেব নও।'

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "জানব না ? আমার বাবা সিভিলিয়ান্ বলে তামাসা করছ তো ? কিন্তু জেনো, সিভিলিয়ানের মেয়ে হলেও ছেলেবেলায় কিছুদিন আমার

পাড়াগাঁয়ে বাস করবার সুযোগ ঘটেছিল। মা মারা যাবার পর বাবা আমায় কিছুদিন এই রকম একটা অজ পাড়াগাঁয়ে আমার মামার বাড়ীতে রেখে এসেছিলেন, সেখানে রোজ রাত্রে দিদিমার কোলের কাছে শুয়ে এই সমস্ত গল্প শুনতুম।” এই বলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, “তা ছাড়া বাংলাদেশের হিন্দু মেয়ে মাত্রেই এই সব পৌরাণিক কাহিনী কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানে। তবে যাঁরা একটু বেশী এরিষ্ট্রোকেট, তাঁরা এই সব কাহিনী সত্যি বলে স্বীকার করতে ভয় পান।”

পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভয়, কিসের ভয়?”

“কেন তাঁদের আভিজাত্যের ভয়, পাছে সমসামাজিক লোকেরা তাঁদের কুসংস্কারাপন্ন মনে করেন!”

মিসেস্ চাটার্জ্জি একটু হাসিলেন। স্বামীকে খোঁচা দিবার জন্য তিনি কথাটা বলেন নাই—এ ভাবে স্বামীকে তিনি কখনও খোঁচা দেন না। মিঃ চাটার্জ্জির কথাটা ভাল লাগিল না। বলিলেন “কুসংস্কার নয় তো কি? ও সব বিশ্বাস করা কুসংস্কার নয়?” এ কথার জবাব দিলে তর্ক বাধিবে, মিসেস্ চাটার্জ্জি বলিলেন, “বেড়াতে যাবে বললে না? চল যাই।”

বিকালের দিক্‌টায় বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল

নদী-তীরে বনবাদাড়ের ভিতর হইতে কেমন একটা সোঁদালী গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চলিতে চলিতে স্ত্রীর বাহুতে মৃদু একটা নাড়া দিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "চল এবার ফেরা যাক।"

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "চল।" তাঁর আরও একটু বেড়াইবার ইচ্ছা হয়ত ছিল, কিন্তু সামান্য কারণে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধবাদী হন না কখনও।

এসেন্স-সুবাসিত রুমালখানা লইয়া মুখের কাছে নাড়াচাড়া করিতে করিতে মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "একটা গন্ধ পাচ্ছ?"

পাশের বনঝোপগুলির দিকে তাকাইয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "হ্যাঁ পাচ্ছি, ছেলেবেলায় বর্ষাকালের দিনে ঠিক এমনিতর একটা গন্ধ পেতুম আমাদের বাড়ীর পেছনের বাঁশ-বাগানটা থেকে। গন্ধটা ছেলেবেলার মনে কথা পড়িয়ে দিচ্ছে।"

মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর নাসিকার অগ্রভাগ ধরিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিলেন "তুমি বড্ড সেন্টিমেণ্টাল, অবশ্য বাংলা দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ তাই হয়ে থাকে।"

হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "তাই যদি হয় সেটা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।"

মিঃ চাটার্জ্জি মনস্তত্ত্বের বড় একটা খোঁজখবর রাখেন না। ভিজে মাটী অথবা বনবাদাড়ের ভ্যাপ্‌সা গন্ধে কেমন করিয়া

যে মানুষের পশ্চাতের জীবনের কতকগুলি অনাবশ্যক কাহিনী মনে আসে, তাহা তিনি ভাবিয়াই পান না।

চলিতে চলিতে মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "কলেজে পড়বার সময় এমনি জ্যোৎস্না রাতে কি করতুম জান?"

হাসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন "জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে পদ্য লিখতে নিশ্চয়ই?"

মিসেস চাটার্জ্জি কোন কথা না বলিয়া মুখ টিপিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন।

মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "আর আমি কি করতুম জান? জ্যোৎস্নাই হোক আর অন্ধকারই হোক, সন্ধ্যে থেকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে বসে শুধু জিওমেট্রীর থিওরেম্ আর প্রবলেম্ সল্‌ভ করে যেতুম।"

মিসেস চাটার্জ্জি অনর্থক ছেলে-মানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

* * *

পরদিন সকাল বেলায় মিসেস চাটার্জ্জি ধোপাকে কাপড় দিবার সময় স্বামীর কোটের পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি আবিষ্কার করিলেন। খামের উপর বাংলায় ঠিকানা লেখা। ষ্ট্যাম্পের উপর তার শ্বশুরবাড়ীর দেশের পোষ্ট অফিসের নামমোহর-করা ছাপটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে।

সংস্কার

পড়া চিঠি, খামটা খোলাই ছিল। মিসেস চাটার্জ্জি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিতা হইলেও বাংলা দেশের অন্যান্য সাধারণ মেয়েদেরই মত শ্বশুর-বাড়ীর সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলেন, দেশ হইতে শ্বশুর মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র মিঃ চাটার্জ্জিকে লিখিতেছেন,

"বাবা নরেন,

অনেক দিন হল তোমাদের কোন খবর পাইনি। আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় বধূমাতা ও তুমি ভালই আছ। আমার শরীরটা মোটেই ভাল নয়। তার ওপর আজ দু'মাস থেকে বাতের বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি, সেই বিলাত থেকে যেদিন আস, সেই দিন ষ্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য তোমায় দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। আমার ঘরের লক্ষ্মী বধূমাতা যে কেমন হয়েছে, তা জানি না। তোমাদের বড় দেখতে ইচ্ছা করে, তোমার ত' গাড়ী রয়েছে, বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী এস না একদিন। তোমার মাতাঠাকুরাণী আজ বেঁচে থাকলে তুমি কি এমনি করে না দেখা দিয়ে থাকতে পারতে? তোমাদের দুজনার নামে সংকল্প করে, বাবা, কালীমায়ের কাছে কাল পূজো দিয়েছি। আর এক কথা, তোমার বোধ হয় মনে আছে, তোমার মাতাঠাকুরাণীর বরাবর ইচ্ছা ছিল কালীমাতা একটু মন্দির করে দেবার জন্য।

ইচ্ছা আছে, মরার আগে মন্দিরটা তৈরী করে দিয়ে যাব। ইট আমার ঘরেই আছে। ইট ছাড়া আরও একশ টাকা খরচ। তুমি পাঠাবে কিছু? আমার অবস্থা ত' জান? কুড়িটি টাকা পেনসন্ যা ভরসা। বধূমাতা ও তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—আশীর্ব্বাদক
তোমার পিতা।

বলা আবশ্যক, মিঃ চাটার্জ্জি স্কলারশিপের টাকায় বিলাত গিয়াছিলেন। সেই কারণে গরীব পিতার উপর তাঁর বিশেষ কোন কর্ত্তব্য নাই মনে করেন। পিতা সামান্য পেন্‌সন্ পান, তাতেই কোন রকম করিয়া পরের বাড়ী খোরাকী দিয়া খাইয়া তাঁর দিন চলিয়া যায়।

মিসেস চাটার্জ্জি চিঠিখানি আর একবার পড়িলেন। "ঘরের লক্ষ্মী বধূমাতা?" কই, এমন কথা বলিয়া কেউ ত তাঁকে সম্ভাষণ করে না! বিবাহের সময় মিঃ চাটার্জ্জি পিতাকে আনাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সামান্য একখানা চিঠি লিখিয়া নিজের বিবাহের কথা জানাইয়া পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য মিঃ চাটার্জ্জি পিতাকে টাকা পাঠান

নাই নিশ্চয়ই ; পাঠাইলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিতেন।

সেদিন দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে কথায় কথায় মিসেস চাটার্জি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে টাকা পাঠান হ'য়েছিল?" মিঃ চাটার্জি চিঠিখানার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "টাকা, কিসের টাকা?"

"মন্দির তৈরীর জন্য।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ", তারপর একটু থামিয়া আবার বলিলেন "আর তুমিও যেমন, ও অজ পাড়াগাঁয়ে মন্দির তৈরী করে কি হবে? তার চেয়ে বরং ঐ টাকা কোন হাঁসপাতালে অথবা স্কুলে দিলে একটা নাম থাকবে।"

ঐ প্রসঙ্গ স্থগিত রাখিয়া মিসেস চাটার্জি বলিলেন, "বাড়ী ত' এখান থেকে বেশী দূর নয়, চল না একদিন বেড়িয়ে আসা যাক!"

পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া মিঃ চাটার্জি বলিলেন, "ভারী বিশ্রী রাস্তা, গাড়ী খারাপ হয়ে যাবে।"

মিসেস চাটার্জি কোন কথা বলিলেন না। সোফায় উপবিষ্ট হইয়া নত মুখে মাফলার বুনিতে লাগিলেন।

*　　*　　*

দিন পাঁচ সাত পরে তাঁরা সদরে ফিরিয়া আসিলেন। গায়ের কোটটা খুলিতে খুলিতে মিঃ চাটার্জি একটা আরামের

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।"

ঈষৎ হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "তোমার সব উল্টো, অমন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে তুমি উঠলে হাঁপিয়ে, আর সহরের এই ঘিঞ্জির মধ্যে এসে তুমি কি না হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।"

তাচ্ছিল্যের স্বরে মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "আরে দূর, দিনরাত কেবল কতকগুলো অসভ্য বর্ব্বর লোকের সঙ্গে কারবার করা।"

স্বামীর পরিত্যক্ত কোটটা 'হ্যাঙারে' টাঙাইয়া দিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "কিন্তু সে কারবারে আমরাই ত' লাভ করি বেশী।"

এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু, অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহারা উভয়েই ড্রইংরুম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পরদিন দুপুর বেলায় মিঃ চাটার্জ্জি কাছারী চলিয়া গেলে মিসেস চাটার্জ্জি শ্বশুরের নামে একশত টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। কুপনে লিখিয়া দিলেন,

"শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনার চিঠি পেয়েছি, আপনার শারীরিক অবস্থা

শুনে আমরা বিশেষ চিন্তিত। বেশীদিন আর আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না। আপনাকে এই দুঃখিনী মেয়ের কাছে থাকতেই হবে। সামনের পূজোর ছুটীতে অমরা আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে যাচ্ছি। মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য একশ টাকা পাঠালাম। আরও দরকার হলে আপনার মেয়েকে আদেশ করলেই পাঠিয়ে দেবে। আমরা ভাল আছি।

ইতি—

প্রণতা—আপনার বধূমাতা।"

কুপনের ঐ টুকু স্থানের মধ্যে এতগুলি কথা তাঁকে খুব হিসাব করিয়া লিখিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই। তিন দিন পরে উক্ত মনিঅর্ডারের রসিদ ফিরিয়া আসিল। তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে একখানা চিঠিতে মনের আবেগে বৃদ্ধ শ্বশুর পুত্র-বধূকে আনাড়ীর মত অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন "মা তোমার চিঠি পেয়ে চোখের জল চেপে রাখিতে পারি নি" ইত্যাদি আরও অনেক কথা। পুত্রের নিকট হইতে টাকা প্রাপ্তির আশা হয়ত তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর বিদূষী পুত্রবধূ যে এতটা হীনতা স্বীকার করিয়া একেবারে তাঁর শ্রীচরণদর্শন-প্রার্থী হইবে, ইহা তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই এবং তাঁর এই অতি-আধুনিকা পুত্র-বধূটীর সম্বন্ধে বরাবরই তিনি অন্যরূপ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন।

কুপনখানা লইয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ী বাড়ী গিয়া যাচিয়া সকলকে দেখাইয়া আসিলেন। ছেলে-ছোকরাদের ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বৌমা শাশুড়ীর নামে কালীমায়ের মন্দির করে দেবেন, তোমরা সব যোগাড়যন্ত্র কর।"

* * *

মিঃ চাটার্জ্জির স্পেয়ার-রুমটা প্রায় সব সময়েই খালি পড়িয়া থাকিত। কালে-ভদ্রে তাঁদের কোন বন্ধুবান্ধব আসিলে সেটা ব্যবহৃত হইত। সেদিন দুপুর বেলায় লাঞ্চ খাইতে আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরটার আগাগোড়া সংস্কার হইতেছে। উপদেষ্টার মত মিসেস স্বয়ং ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া।

মিঃ চাটার্জ্জি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে না চাহিয়াই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেউ আসছেন না কি ?

"হ্যাঁ, বাবা আসছেন।'

রিটায়ার করিবার পর মিসেস চাটার্জ্জির পিতা দার্জ্জিলিঙে বাড়ী কিনিয়া তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সেইখানে ভদ্রাসন গাড়িয়াছিলেন। বাড়ীঘর ছাড়িয়া তিনি কোথাও যান না বড় একটা। মিঃ চাটার্জ্জি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা আসবেন ?"

"অবাক্ হচ্ছ বুঝি ?"

'না না তা বলছি না, তবে তিনি আসেন না কি না কখনও

তাই বলছি।"

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়িল, দেয়ালের গায়ে। মিঃ চাটার্জ্জি সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিলাতী ছবিগুলির পরিবর্ত্তে দেয়ালের গায়ে কতকগুলি দেব-দেবী, পরমহংস ও বিবেকানন্দের ছবি টাঙানো হইয়াছে। ফস করিয়া তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "সর্ব্বনাশ, এ সব কি?"

শান্ত সংযত কণ্ঠে মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বাবা দেব-দেবীর ছবি খুব ভালবাসেন কি না, তাই।"

"সে কি, তিনিই না তোমার মায়ের মৃত্যুর পর মেম্ বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন?"

"ওসব কতকগুলো দুষ্টু লোকের মিথ্যা রটনা।"

খোলা জানালা দিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বাহিরের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মিসেস চাটার্জ্জি তাঁর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন,

"তোমার কোন অসুবিধে হবে না ত?"

"অসুবিধে, অসুবিধে হবে কেন? না—না।"

"ঠিক ত?"

হ্যাঁ ঠিক।"

অতঃপর তাঁরা দুজনে লাঞ্চ খাইবার জন্য ডাইনিং রুম

অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

*　　　*　　　*

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুর বেলায় মিসেস চাটার্জ্জি তাঁর পিয়ানোটির সম্মুখে বসিয়া একটি ইংরাজী সুর বাজাইতেছিলেন, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, একটা লোক সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

মুখ তুলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বোল দেও সাব অভি নেহি হ্যায়।"

"উ ত বোলা হ্যায় হুজুর, ফিন কোঠিকা অন্দরমে ঘুসনে মাংতা।"

"বোল দেও চার বাজনেসে আনে কো আস্তে।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় পিয়ানোয় মনসংযোগ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পিয়ানোর চাবিগুলো নাড়াচাড়া করিবার পর মিসেস চাটার্জ্জি একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন।

বেলা তখন প্রায় তিনটা, ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি অভ্যাসমত বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিক্ ওদিক্ হইতে তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়িল ওধারে গেটের সামনে অশ্বথ গাছটার ছায়ায় বসিয়া কে একটা লোক তাঁদের কোয়ার্টারের দিকে নির্ণিমেষ চাহিয়া আছে। লোকটার বয়স বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌছিয়াছে, চুলগুলি সব ধব ধবে সাদা, গায়ে

একটা চায়না কোট।

লোকটার বয়সমলিন মুখখানার পানে চাহিয়া অকারণে মিসেস চাটার্জ্জির মনে কেমন একটা অদ্ভুত মমত্ববোধের সৃষ্টি হইল। বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দুপুর বেলায় সাহেবকে যে খুঁজিতে আসিয়াছিল সে এই লোকটা কি না? লোকটার দিকে একবার তাকাইয়া বেয়ারা বলিল, জী হ্যাঁ, দেখিয়ে আভিতক্ বৈঠ হ্যায়।"

মিসেস চাটার্জ্জি লোকটাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বেয়ারাকে আদেশ করিলেন।

লোকটি নিকটে আসিলে তার দিকে চাহিয়াই মিসেস চাটার্জ্জির কেমন করিয়া যেন মনে হইল, ইনি নিশ্চয়ই তাঁর শ্বশুর মুখের আদল অনেকটা ঠিক তাঁর স্বামীর মত, বিশেষ করিয়া মিঃ চাটার্জ্জির চোখ দুটির সহিত এই লোকটির চোখের চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীতে কি নরেন থাকে?" মিসেস চাটার্জ্জির আর কোন সন্দেহ রহিল না, "হ্যাঁ" বলিয়া একটুখানি হাসিয়া লোকটির পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিলেন।

বৃদ্ধ অস্ফুট স্বরে কি একটা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া অবাক্ বিস্ময়ে মিসেস চাটার্জ্জির পানে চাহিয়া রহিলেন। সলজ্জ ভাবে

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "ও মেয়েকে বুঝি এখনও চিনতে পারছেন না বাবা ?"

আড়ষ্ট কণ্ঠে বৃদ্ধ শুধাইলেন "কে মা তু···আপনি ?"

"আপনার মেয়ে বাবা। এতদিনে বুঝি মেয়েকে মনে পড়ল ?'

হৃদয়াবেগ রোধ করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ খপ করিয়া মিসেস চাটার্জ্জির একখানা হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। মিসেস চাটার্জ্জির চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "কাঁদবেন না বাবা, আপনার মেয়ের যে অকল্যাণ হবে।"

"ঠিক বলেছ মা, কাঁদব না" এই বলিয়া বৃদ্ধ জামার হাতায় চক্ষু মুছিলেন।

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "খবর দেন নি কেন বাবা ? আপনার মেয়ে ঠিক ষ্টেশনে গিয়ে হাজির থাকত।" বৃদ্ধ বলিলেন, 'কি করে খবর দেব মা, তোমার চিঠি পেয়ে অবধি তোমাদের দেখবার জন্যে প্রাণটা বড় ছটফট করছিল, কাল রাতে হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম। ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই দিলে ট্রেনখানা ছেড়ে পরের ট্রেন আবার সেই দশটায়।" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটা হাই তুলিলেন।

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "আপনার নাওয়া খাওয়া হয় নি ?"

প্রসন্ন হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "গাড়ীর কাপড়ে আমি ত' কিছু খাই না মা।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "আসুন বাবা, আপনার জন্য সব গুছিয়ে রেখেছি!"

মিসেস চাটার্জ্জির ইচ্ছা ছিল, পূজার ছুটীতে তাঁরা দুজনে দেশে গিয়া শ্বশুরকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু তাঁহাদের আনিতে যাওয়ার আগেই যে বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এখানে আসিয়া হাজির হইবেন, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। যেরূপ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাঁরা বসবাস করেন, তার পাশে এই সদাচারী ব্রাহ্মণকে খাপ খাওয়ান হয়ত তাঁদের সমসামাজিক লোকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু হইবে, কিন্তু সমাজ অপেক্ষা এই স্নেহশীল বৃদ্ধটি কি তাঁর স্বামীর বেশী আপনার নয়? একটা মিথ্যা অভিজাত্যের দম্ভ দিয়া তিনি কি তাঁর আশৈশব মধুর সম্পর্কটাকে অস্বীকার করিয়া একটা পাতান সম্বন্ধসূত্রে গ্রন্থি গাঁথিতে চান?

পুত্রবধূর সহিত বৃদ্ধ তাঁর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া ঘরটার চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বাঃ ছবিগুলি ত বেশ।"

বাজার হইতে ছানা ও ফল আনাইয়া মিসেস চাটার্জ্জি শ্বশুরকে জল খাওয়াইলেন। তার পর ভাঁড়ার-ঘরের জিনিষ-পত্রগুলি খাবার ঘরে সরাইয়া একটা বালতিতে উনুন পাতিতে বসিলেন। এমন সময় গাড়ীবারান্দার নীচে মিঃ চাটার্জ্জির

মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। মিঃ চাটার্জ্জি গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে ভাঁড়ার-ঘরের পাশে বসিয়া স্বহস্তে উনুন পাতিতে দেখিয়া বিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে ও কি হচ্ছে ?"

মিসেস চাটার্জ্জি স্বামীকে হাত নাড়িয়া থামিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "বাবা এসেছেন যে।"

স্ত্রীলোকের মন সাধারণতই রহস্যপ্রবণ। মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর এই উনুন পাতার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা এসেছেন ত উনুন পাতছ কেন ?"

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বাবা কি তোমার ঐ বকাউল্লা খানসামার হাতের রান্না খাবেন না কি ?" এই বলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন, আমরা অনার্য্য হতে পারি, কিন্তু উনি ত রার অনার্য্য নন্।"

স্ত্রীর ভাবভঙ্গী ভাল বুঝিতে না পারিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "অনার্য মানে ?"

"অনার্য্য মানে যে সমস্ত তথাকথিত আর্য্য সামাজিক আচার-বিচার না মেনে বাহাদুরী দেখিয়ে বেড়ায়।"

ওদিক্‌কার দরজার দিকে নজর পড়ায় মিঃ চাটার্জ্জি সবিস্ময়ে দেখিলেন দুয়ারের পর্দ্দা ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পিতার। বহুকাল পরে মিঃ চাটার্জ্জির কণ্ঠ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল, "বাবা !"

ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোকে ছেড়ে কি করে যে আমি আছি বাবা।" মিঃ চাটার্জ্জি পিতার শীর্ণ বুকখানির উপর মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিগারেটটা তাঁর হাত হইতে কখন মেজের উপর খসিয়া পড়িয়াছিল।

পূজার আর দিন আষ্টেক মাত্র বিলম্ব ছিল। পুত্র ও পুত্রবধূ ইহার মধ্যে কিছুতেই আর বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিলেন না। স্থির হইল, ষষ্ঠির দিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করিবেন।

যাত্রার দিন মিসেস চাটার্জ্জির বেশভূষা পারিপাট্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা গেল। স্নানের পর মাথার চুলগুলি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পাশ দিয়া পিঠের উপর এলাইয়া দিয়াছেন। দুই ভ্রূর মাঝখানে ছোট্ট একটি সিঁদুরের টীপ, পরণে একখানি সুপবিত্র তসরের শাড়ী, শুভ্র দুখানি পাদুকাবিহীন চরণপ্রান্তে অলক্তরেখা, সর্ব্বাঙ্গে মহিমাময়ী লক্ষ্মী-প্রতিমার মত নারীর পবিত্র-শ্রী। তাঁহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!" মিঃ চাটার্জ্জি যখন পোষাক বদলাইয়া ড্রেসিং রুম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন, তাঁহাকে দেখিয়া মিসেস চাটার্জ্জি আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

ট্রাউজারের পরিবর্তে পরণে একখানি আধ ইঞ্চি চওড়া কালপেড়ে মিহি ধুতি, গায়ে ঢিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় উড়ুনি জড়ান—নিখুঁত বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

রহস্য করিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "আজ যে বড় ধুতি পরেছ?"

"দেশে যাচ্ছি যে।"

"সেখানে গিয়ে কিন্তু শাক-চচ্চড়ী ভাত খেতে হবে।"

"ও আমার অভ্যাস আছে, আজন্ম ঐ খেয়েই মানুষ।" বলিয়া হাসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি মোটরে উঠিয়া পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বহুদিন পরে দেশমাতৃকার নিরুদ্দিষ্ট সন্তান শুষ্ক মাটীতে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

মোটর হইতে নামিয়াই মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "গাড়ীটার কিছু খারাপ হয়নি ত?"

মুখ ফিরাইয়া সোফার উত্তর দিল, "জী নেহি, রাস্তা একদম ঠিক হ্যায়।"

মিঃ চাটার্জ্জির পিতা ততক্ষণে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। মুখ টিপিয়া হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বলেছিলে, রাস্তাটা নাকি ভারি বিশ্রী, গাড়ী খারাপ হয়ে যাবে?"

অন্যমনস্কভাবে মিঃ চাটার্জ্জি উত্তর দিলেন, তারপর হয় ত সংস্কার হয়েছে।”

“কার, রাস্তার না তোমার ?”

“হয় ত দুয়েরই।”

“কিন্তু সংস্কার করলে কারা ?”

“যাদের দরকার বেশী।”

মিসেস চাটার্জ্জি আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে একটি মেয়ে, প্রায় মিসেস চাটার্জ্জিরই সমবয়সী, ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, “এস এস বৌদি, কে আর বরণ করবে বল ? জোঠাইমা ত আর নেই।” এই বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ উলুধ্বনি করিয়া উঠিল।

মেয়েটি মিঃ চাটার্জ্জির দূরসম্পর্কের খুল্লতাত-ভগ্নী।

সোহাগী

মুখুজ্জেদের শেওলা দিঘীর পাশ দিয়া ঐ যে সরু মেটে পথ আমবাগানের মধ্য দিয়া আলো ও ছায়ার জাল বুনিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া হলদেডাঙ্গার মাঠে গিয়া মিশিয়াছে উহার প্রান্ত সীমায় মাণিক দুলের বাস।

একটিমাত্র মেয়ে সোহাগী ছাড়া তাহার এ পৃথিবীতে আপনার জন আর কেহ আছে কিনা মাণিকের তাহা স্মরণ হয় না। প্রায় এক যুগ হইল তাহার স্ত্রী চার বৎসরের সোহাগীকে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে কোথাকার এক নিশ্চিন্দিপুরে গমন করিয়াছে। সেই হইতে এই মেয়েটীর মায়ায় মাণিকের এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার দাবী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মেয়েটীই হইয়াছে এই পৃথিবীতে তাহার পরম আশ্রয়স্থল। আজ এগার বৎসর ধরিয়া সে প্রাণপণ যত্নে তাহার এই জীর্ণ আশ্রয়টীকে সমগ্র শক্তির সাহায্যে সংসারের সকল ঝড় ঝাপ্টা হইতে আড়াল করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহার শান্ত অচঞ্চল মন সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে এই মেয়েটীর শুভ-

চিন্তা কামনা করিয়া। সোহাগীর চিন্তা ছাড়া অপর কোন চিন্তা তাহার মনে বড় একটা স্থান পায় না। দিনান্তে সে ভগবানকে ডাকে, সেই ডাকের অক্ষরে অক্ষরে যে ব্যাকুলতা ফুটিয়া ওঠে তা শুধু সোহাগীর জন্য।

সোহগী এখন ষোড়শী যুবতী। অপরূপ সুন্দরী না হইলেও এই শ্যামলা মেয়েটীর দেহলতার যে অপূর্ব্ব লাবণ্যচ্ছটা জড়ান আছে তাহা দুলের ঘরের সাধারণ মেয়েদের অঙ্গে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাহার পুরন্ত মুখের নবারুণ আভায় মাণিক দেখিতে পায় এগার বছর আগেকার তাহার স্ত্রীর অতীত প্রতিচ্ছবি আজ যেন সোহাগীর ভিতর দিয়া ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠিয়াছে। সোহাগীর মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলে, "এবার তোকে পার করে দিতে হ'বে মা। তোকে ত' আর ঘরে রাখা চলে না।"

সোহাগী চুপটি করিয়া বাপের শীর্ণ বুকের মধ্যে মাথা রাখিয়া আবেশে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে। মাণিক ঘরের দেয়ালের গায়ে সোহাগীর হাতের চিত্র-বিচিত্র করা আল্পনার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কতকটা আপন মনে বলিতে থাকে, "তুই বড় হ'য়েছিস, লোকে আমাকে কত কথাই বলে, কিন্তু তারা ত আর বোঝে না যে, তুই আমার চারিধার ঘিরে কতদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে আছিস ?"

সোহাগী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বাপের বুক হইতে মুখখানা সরাইয়া লইয়া বলে, "যাই বাবা ছাগলটা এখনও বাইরে বাঁধা রয়েছে—সন্ধ্যে হ'য়ে এল বলে, আবার এক্ষুণি কিছুতে কামড়াবে।" সোহাগী উঠিয়া যায়। মাণিক একদৃষ্টে তাহার চলার গতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবে "ভগবান হয়ত ভুল করিয়া সোহাগীকে আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে পঠিয়েছেন, আহা এখানে ওকে মোটেই সাজে না।" পর-ক্ষণেই সে মনে মনে বলে, "না না ভগবান ভুল করেন নি। সব কিছু হারানর পর এই অবলম্বনটীকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবার জন্যই ভগবান সোহাগীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মুখুজ্জেদের বাড়ীর ছেলে বিমান তাহাদের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া কলেজে পড়ে। কলেজের অবকাসে মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসে। সারাদিন মাঠে মাঠে বাগানে ঘুরিয়া, পুকুরে মাছ ধরিয়া, বনফুল সংগ্রহ করিয়া ছুটির দিনগুলো কোন রকম করিয়া কাটাইয়া দেয়।

সেদিন বিকাল্ বেলায় সে হলদেডাঙ্গার মাঠের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখিল একটী অনূঢ়া যুবতী মাঠের পুকুর হইতে জল লইয়া ধীরে ধীরে সামনের বাড়ীটায় ঢুকিয়া গেল। অতি অপরূপ তার অঙ্গসৌষ্ঠব। দারিদ্র্য হইতে সঞ্চিত কাঞ্চন ফুল

রঙের অল্প দামী হেটো সেমিজের ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র নিটোল হাত ঘড়াটার গলায় জড়ান।

সভ্য সমাজ হইতে বহুদূরে হলদেডাঙ্গার নীল নির্জ্জন প্রান্তরে মাণিক দুলের ঘরে সোহাগীর অঙ্গের অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা তাহাকে এক আনন্দময় কল্পরাজ্যে লইয়া গিয়া ফেলে—যেখানকার সৌন্দর্য্যের মহিমায় ব্রাহ্মণ ও দুলের মধ্যবর্ত্তি ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। বিমান আবার তাকায় কিন্তু সোহাগীকে দেখিতে পায় না। মনের ভাবে বিহ্বল হইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

তারপর প্রতিদিন অলস অপরাহ্নে ত্রস্ত চরণযুগল তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় দুলে-পাড়ার হলদেডাঙ্গার মাঠের ধারে। তৃষিত নয়ন তাহার মাত্র এক দিনের কাহার একখানি চেনা মুখ দেখার আশায় মাঠের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায়। কে জানে কেমন করিয়া তাহার এই চঞ্চলতা সোহাগীর চোখে সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। তাই সে পারত পক্ষে বিমানের বুভুক্ষু নয়নের দৃশ্যপটে নিজেকে ধরা দিতে চায় না। রৌদ্র পড়িবার আগেই সেহাগী কাপড় কাচা, জল আনা ইত্যাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লয়।

বিমান খানিকক্ষণ মাঠের এধার ওধার ঘুরিয়া মাণিকের বাড়ীর পাশের সরু পথটা দিয়া নিষ্প্রয়োজনে অনেক দূর পর্য্যন্ত

বেড়াইতে বেড়াইতে চলিয়া যায়। তারপর যখন ফিরিয়া আসে তখন মাঠের চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাণিকের জানালার ফাঁক দিয়া প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি আসিয়া পথে পড়িয়াছে, সারাটা পথের ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুকে এই একটুখানি আলোক রেখা বিদ্রূপের মত।

সোহাগীর বিয়ের সম্বন্ধ হইল ও পাড়ার বাদল দুলের ছেলে মোহনের সাথে। বাদলের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। খাল বিল জমি জমা লইয়া মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া হাতে বেশ দু'পয়সা করিয়াছে। একমাত্র ছেলে মোহন গ্রামে চৌকিদারির কাজ করে ছেলেটী খুব সৎ, দেখিতেও মন্দ নয়। কাজেই সোহাগী বেশ সৎপাত্রে পড়িবে নিশ্চয়ই।

তাহারা পঞ্চাশ টাকা দাদন চায়। মাণিকের আরও কোন্ না পঞ্চাশ টাকা ঘর-খরচা আছে। সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না কোথা হইতে এই একশত টাকা জোগাড় হইবে? তবুও তাহার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে আনন্দের ছায়া উঁকি ঝুঁকি মারে। যদি কোন রকমে সে টাকাটা যোগাড় করিয়া এই বিয়ে দিতে পারে তাহা হইলে তাহার সোহাগী সুখী হইবে। আর সোহাগীকে সুখী হইতে দেখাই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য। সে পরম উৎসাহে পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবদের কাছে দু'শত টাকা ধার চাহিয়া বেড়ায়।

সোহাগী

বিয়ের কথায় সোহাগীর সর্ব্বদেহ এক অজানা পুলকে শিহ-রিয়' উঠিল। আজ সে সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিল যে সে বড় একলা, সাথীহারা নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিনের পর দিন তাহাকে কাটাইয়া চলিতে হয়। নিরালায় বসিয় সম্মুখ ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল চিত্র সে আপন মনে ভাঙ্গিতে গড়িতে লাগিল। চির পরি-চিত গতানুগতিক পথের মোড়টা যদি ঈষৎ ঘুরিয়া যায় তাহা হইলে সে সুখী—পরম সুখী—। অনেক দিনের পথ আজ তাহার মায়ের জন্য অত্যন্ত মন কেমন করিতে লাগিল। আবছা আবছা মায়ের মুখখানা বার বার স্পষ্ট করিয়া স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাদলের ছেলে মোহনের সাথে সোহাগীর বিয়ের ঠিক করিয়া প্রথম প্রথম মাণিকের খুবই আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু দিনের পর দিন যখন পাড়া প্রতিবেশীদের দ্বারে অর্থের আশায় বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে লাগিল তখন তাহারা সকল আশা ক্রমশঃ বিষাদের অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতে লাগিল!

বিয়ের আর মাত্র চারিদিন বাকি। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়রাণ হইয়া সন্ধ্যার পর মাণিক বাড়ী ফিরিয়া দাওয়ায় মাদুরে শরীর এলাইয়া দিল। রান্না ঘর হইতে সোহাগী ডাকিল "বাবা তোমার ভাত বাড়ব—সেই ত সকালে খেয়ে বেরিয়েছ।"

মাণিক চক্ষু মুদিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া কি ভাবিতেছিল। মেয়ের ডাকে চমকাইয়া উঠিয়া জবাব দিল, "এখন থাক্‌গে, একটু পরে খাব'খন।" তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ডাকি, "সোহাগী একবার এখানে আয় না মা!" তরকারি ঢালিতে ঢালিতে সোহাগী উত্তর দিল "যাই বাবা।"

সোহাগী আসিয়া বাপের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বল্‌ছো বাবা?" হাত দিয়া মাদুরের প্রান্ত দেখাইয়া দিয়া মাণিক কহিল, "ব'স না মা।"

মাদুরের উপর বসিয়া বাপের কপালের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সোহাগী কহিল, "মাথাটা টিপে দোব বাবা?"

মাণিক সোহাগীর একখানি হাত কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না মা থাক, এই আগুণের তাত থেকে এলি এখানে হাওয়ায় একটু বোস।" পাশে বসিয়া সোহাগী ধীরে ধীরে বাপের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

কাৎ হইয়া শুইয়া মাণিক এক দৃষ্টে সোহাগীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সোহাগীর গাল দুইটা আল্‌গা করিয়া টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "আজ বাদে কাল তুই পরের ঘরে চলে যাবি, তোকে ছেড়ে আমি একলা এখানে কি কোরে থাকব বলত!"

সোহাগী কোন কথার জবাব দিল না। লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আপন মনে মাণিক বলিতে লাগিল, "তোর যে কি হ'বে মা—আজও পর্য্যন্ত কিছু'ত সুবিধে করতে পারলুম না।" তারপর ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া খাটো গলায় কহিল, "দেখি, কাল না হয় একবার মুখুজ্জে বাবুদের হাতে পায়ে ধরে—বাগানটা রেখে যদি শ'খানেক টাকা জোগাড় করতে পারি।"

সোহাগী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাই বাবা এবার ভাত বাড়ি গে।"

মাণিক কহিল, "যা মা, যা।"

সন্ধ্যাবেলায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া কুটনো কুটিতে কুটিতে সোহাগীর হঠাৎ মনে হইল বাগান হইতে ছাগলটা এখনও আনা হয় নাই। বঁটীটাকে কাৎ করিয়া রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল বাগানের দিকে।

ছাগলটাকে লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে বিমান ধূমকেতুর মত আসিয়া হাজির হইল। সোহাগী তাহাকে এসময়ে হঠাৎ এমন করিয়া তাহার দিকে আসিতে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। তাহার মুখে চোখে এক অসহায় বিহ্বলতার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

শান্ত সংযত কণ্ঠে বিমান তাহাকে বলিল "সোহাগী তোমার বাবা আজ আমাদের বাড়ী গিয়েছিল টাকার জন্য, বাবা হ'বে

না বোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমার বাবাকে বোলো কাল সকালে একবার আমার কাছে যেতে, আমি টাকা দেব।" সোহাগী মাটীর দিকে চাহিয়া শুধু নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল। উচ্ছ্বসিত আবেগে বিমান খপ্ করিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কহিল, "সোহাগী তোকে আমি ভালবাসি, গেল বছর আমার যে বোনটী মারা গেল তার মুখখানা ঠিক তোর মতই ছিল। তোর মুখ দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ে।" বিমানের দুই চোখের কোনে অশ্রু টল্‌মল্ করিতে লাগিল। সোহাগী নিশ্চল হইয়া পূর্ব্ববৎ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। বিমান তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, তোর বিয়ের পর তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু তোর এই দাদাটীকে যেন ভুলে যাস্‌নি, দিদি!"

সোহাগী শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে ভুলিবে না। তাহার কণ্ঠ দিয়া কোন কথা সরিতেছিল না। বিমান তাহার পিঠের উপর হাত দিয়া কহিল, "যা ঘরে যা, অন্ধকার হ'য়ে আস্‌ছে। সকাল সকাল বাইরের সব কাজকর্ম্ম সেরে ফেলবি, বোকা মেয়ে সন্ধ্যের পর তোর কি এখন বাইরে আসা উচিৎ?" এই বলিয়া একটুখানি হাসিয়া বিমান সামনের পথ ধরিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। সোহাগীও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। তাহার চোখের সামনে সৌন্দর্য্য মাখান এই পৃথিবীটা যেন সকল

রহস্য, সকল বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আলোর আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই দেখিতে পাইল না যে দূর হইতে মাণিক তাহাদের দুইজনের এই ভাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছিল।

সারাদিন অর্থ সংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া একে তাহার মেজাজটা ভাল ছিল না। তাহার উপর সোহাগীকে বিমানের সহিত এরূপ অবস্থায় হঠাৎ দেখিয়া তাহার মাথার ভিতর দপ করিয়া যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে টলিতে টলিতে তাহার ঘরের দিকে গিয়া দুই হাতে দুই রগ টিপিয়া সোহাগীর অপেক্ষায় চুপ করিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল।

সোহাগী ছাগল লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই মাণিক ডাকিল, "সোহাগী এ-দিকে আয়।" ধীরে ধীরে বাপের কাছে যাইয়া সোহাগী জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বাবা ?"

উত্তেজিত কণ্ঠে মাণিক প্রশ্ন করিল, "বাগানের ভিতর বিমানের সঙ্গে এতক্ষণ কি হ'চ্ছিল ?"

সোহাগী পিতার এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে থতমত খাইয়া গেল, মাণিকের রাগও বাড়িয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চিৎকার করিয়া মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "বল শিগগির।" সোহাগী বাপের এই রকম ভাবে ত্রস্ত

বিহ্বল হইয়া গিয়া আমতা-আমতা করিয়া কহিল, "বিমান দা' তোমাকে···।"

মাণিক "হুম" করিয়া তাহার পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিল একখানা কাঠের পিঁড়িপড়িয়া রহিয়াছে। সেইটা তুলিয়া লইয়া সোহাগীর কপাল লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল।

আকস্মিক বাপের হাতের এই প্রথম প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সোহাগী অস্ফুট স্বরে "মা গো" বলিয়া ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেল। হাত হইতে ছাগলের দাড়িটা খসিয়া গিয়াছিল। ছাগলটা ভয়ে ব্যা-ব্যা করিতে করিতে উঠানের খোলা দরজা দিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সোহাগীর রগ ফাটিয়া ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। মাণিক কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ছুটিয়া উঠিয়া গিয়া ঘরের কলসী হইতে জল আনিয়া মাথায় ঝাপ্টা দিতে লাগিল। সোহাগীর মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া বড় আদরের সহিত ডাকিল "সোহাগী।" সোহাগী যেন অতি কষ্টে বাপের মুখের দিকে একবার চাহিল। তাহার পাতলা ঠোঁট দুটী থাকিয়া থাকিয়া দু' একবার কাঁপিয়া উঠিল, হয়ত বাপকে বলিতে চাহিতেছিল সে নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই সব শেষ।

ঠিক সেই সময় বিমান তাহার ঘরে এটাচি কেস হইতে টাকা

বাহির করিয়া তাহার মণিব্যাগে পুরিতেছিল, কাল সকালে মাণিক আসিলে তাহাকে দিতে হইবে। সোহাগীর ভবিষ্যৎ সুখ-সম্ভাবনায় সে আন্তরিক সুখী হইয়াছিল। ভাবিল আজকের দিনটী কাটিল বেশ।

পরের দিন সকাল বেলায় হলুদেডাঙ্গার মাঠের অন্য সব দুলেরা ও গাঁয়ের অন্যান্য অনেক লোক সবিস্ময়ে দেখিল মাণিক দুলের মেয়ে সোহাগী রক্তাক্ত কলেবরে উঠানে মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে আর মাণিক তাহার ঘরের আড়কাঠায় দড়ি টাঙাইয়া গলায় দিয়া মরিয়া ঝুলিতেছে

সাত ভাই চাম্পা

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাগ ষ্টেশন। একখানা পুরাতন ওয়াগনের চাকাগুলি খুলিয়া মাটীতে বসাইয়া কৃত্রিম একটা ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে একখানা টেবিল ও একটা আলমারী লইয়া আমাদের আখডাঙ্গার ষ্টেশন। পাশেই একটা অনুরূপ ওয়াগনের মধ্যে আমার কোয়ার্টার। তাহা ছাড়া চতুর্দ্দিকে শুধু দিগন্ত জোড়া উন্মুক্ত মাঠ আর সবুজ ধানের ক্ষেত।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতটা তখন বেশ জাঁকিয়া পড়িয়াছে। একদিন সকাল বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি আশপাশের মাঠগুলোতে মহাসমারোহে ধান কাটা সুরু হইয়াছে। ষ্টেশনের পিছনে নীচু জমিটায় কয়েক-জন কৃষক মাথায় গামছা বাঁধিয়া উৎসাহে কাজে লাগিয়াছে। জমির আলের উপর বসিয়া একটী বৃদ্ধ তামাক টানিতে টানিতে তাহাদের কার্য্যকালাপ পর্য্যবেক্ষণে রত। বৃদ্ধটী হয় তঐ জমিটার মালিক আর ঐ লোকগুলি তাহারই নিযুক্ত কিষান, অত বড় জমিটার মালিক যে, মা লক্ষ্মী যাহার ঘরে পরিপূর্ণরূপে

বিরাজমান তাহাকে আর স্বহস্তে জমি চাষ করিতে হয় না।

এখানে আমি নূতন আসিয়াছি, বিশেষ কাহারও সহিত আলাপ পরিচয় হয় নাই এখনও। ষ্টেশনের কাজকর্ম্ম সারিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন মাঠের দিকে গেলাম, সূর্য্য কিরণ-স্নাত পাকা ধানের ক্ষেতে কর্ম্মক্লান্ত কিষাণের দল তখন কর্ম্মে ক্ষান্ত দিয়া পথিপার্শ্বের আশথ গাছটার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে। তাহাদের সম্মুখে বসিয়া বছর পনের ষোল'র একটি গৌরাঙ্গী কিশোরী ধামা হইতে মুড়ি লইয়া কিষাণদের গামছায় আঁজলা করিয়া ঢালিয়া দিতেছে। আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধটী বলিল, নমস্কার মাষ্টার বাবু, বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ?" পঁচিশ টাকা বেতনের ষ্টেশন মাষ্টার আমি, অনেকেই আমাকে চেনে, ষ্টেশন মাষ্টার বলিয়া একটু সম্ভ্রমও করে। বৃদ্ধটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এবার ধান কেমন হলো মোড়োল ?"

"অমনি হলো একরকম বাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে" বিনীত ভাবে মোড়াল উত্তর দিল।

মেয়েটী এতক্ষণ একপাশে বসিয়াছিল, আমাকে মোড়লের সহিত গল্প করিতে দেখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এবার আমি যাই বাবা।"

তামাক টানিতে টানিতে মোড়ল বলিল, "আচ্ছা মা এস।"

মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ওটী বুঝি তোমার মেয়ে।"হ্যাঁ

বাবা—ঐ একটী মাত্তর মেয়ে” এই বলিয়া বৃদ্ধ অতি সন্তর্পণে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। কিষাণদের মধ্যে যে লোকটী সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, “তুমি ও বাড়ী গেলে না কেন বাবা?”

ঐ লোকটীর সম্বোধনে বুঝিতে পারিলাম যে সে তাহারি ছেলে। জিজ্ঞাসা করিলাম “তোমার ক’টী ছেলে মোড়োল?” বিশ্রামরত চারটী লোককে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া মোড়ল বলিল “ঐ যে বাবু চারটী।” লোকগুলি তাহার মাহিনা করা চাকর নয়, মানুষ করা ছেলে। চাষাবাদের কথা লইয়া মোড়লের সহিত কিয়ৎক্ষণ গল্প করিয়া সেদিনকার মত উঠিয়া আসিলাম।

পরদিন সকাল বেলায় ষ্টেশনের কাজকর্ম্ম সারিয়া কুকারে রান্না চাপাইবার জন্য বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতেছি, এমন সময় একটা ঘটী হাতে করিয়া মোড়লের মেয়েটী আসিয়া বলিল “একটু জল নেব মাষ্টার বাবু?” তাহার কণ্ঠস্বরে লজ্জা বা কুণ্ঠার লেশমাত্র নাই। ষ্টেশনের টিউবওয়েল হইতে মেয়েটিকে জল লইবার অনুমতি দিয়া তরকারীগুলি ধুইবার জন্য তাহার পিছনে পিছনে অমিও টিউবওলের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমার হাতের চুবড়ীটার দিকে আড়চোখে একবার তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া মেয়েটী বলিল “ও, আপনি বুঝি কুটনো ধোবেন?

দাঁড়ান আমি ধুয়ে দিচ্ছি।” এই বলিয়া সে আমার হাত হইতে চুবড়ীটা টানিয়া লইয়া আমাকে টিউবওয়েলটা পাম্প করিতে ইঙ্গিত করিল। কুটনোগুলি ধোয়া হইলে চুবড়ীটা এক পাশে রাখিয়া মেয়েটী বলিল “এবার আমি জল নিই একটু। বলিলাম “নাও।” ঘটীটা পূর্ণ হইলে ঢক ঢক করিয়া ঘটীর জলটুকু পান করিয়া মেয়েটী বলিল “আঃ জলটা ত বেশ ঠাণ্ডা।” মেয়েটির ছেলে মানুষী দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছিল—বলিলাম “পাতাল থেকে আস্‌চে কি না?”

অনর্থক একটুখানি হাসিয়া মেয়েটি আর এক ঘটি জল লইয়া মাঠের পথে নামিয়া গেল।

সেই হইতে প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম মেয়েটি ষ্টেশনের টীউব-ওয়েল হইতে জল লইয়া যাইতেছে। কোনদিন বা আমার সহিত দু' একটা কথাবার্ত্তা কহিত, কোনদিন আমাকে কর্ম্মব্যস্ত দেখিয়া নিঃশব্দে জল লইয়া সে চলিয়া যাইত।

দিন পনের পরের কথা।

মাঠের ধান কাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাটা ধানগুলি মাঠেতেই গাদা দিয়া ধান ঝাড়া সুরু হইয়াছে। অবসর মত এক একদিন মাঠে গিয়া গাছতলায় বসিয়া মোড়লের সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ চাষাবাদ সম্বন্ধে গল্প করি। এই কয়দিনের আলাপে তাহার সঙ্গে বেশ একটু ঘনিষ্টতাও হইয়াছে। এই সব সরল

স্বতঃস্ফূর্ত্ত পল্লীপ্রাণ লোকটিকে আমার লাগে মন্দ নয়। কথায় কথায় একদিন মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে মোড়োল ?

বিস্মিত চোখে আমার মুখের পাণে তাকাইয়া মোড়োল বলিল "ও আপনি জানেন্ না বুঝি, অনিলা যে বিধবা।" মোড়ালের মেয়েটির নাম অনিলা। জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কি মোড়োল, ঐটুকু মেয়ে বিধবা ?"

নির্লিপ্তকণ্ঠে মোড়োল বলিল "হ্যাঁ, পাঁচ বছর বয়সে মাকে আমার গৌরীদান কোরে পূণ্যি কোরেছিলুম, বছর পেরুতে না পেরুতেই হাতে হাতে সেই পুণ্যির ফল ফল্‌লো।" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর যেন এক প্রাণান্তকারী নির্ম্মম বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। এমন সময় দূরে অনিলাকে মুড়ীর ধামা হাতে করিয়া মাঠের দিকে আসিতে দেখিয়া ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ছেলেদের সব বিয়ে হয়ে গেছে ? তামাক টানিতে টানিতে অন্যমনস্কভাবে মোড়োল শুধু বলিল "হ্যাঁ।"

বৈকাল বেলা ষ্টেশন ঘরের সম্মুখে বসিয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্‌টাইতেছিলাম। দূরে অস্পষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে অপরাহ্নের ম্লান সূর্য্য তখন অস্তদিগন্তে। পাক ধান-

ক্ষেতের বুকে অপরাহ্নের মিলাইয়া যাওয়া শেষ রোদ যেন আলো ও ছায়ার জাল বুনিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে বেশ একটা নয়নাভিরাম রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

সহসা গেট খোলার শব্দে পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, দুহাতে গেট ঠেলিয়া অনিলা ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে এ সময়ে তাহাকে এখানে আসিতে দেখি নাই কখনও। নিকটে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ যে এ সময়ে অনিলা, গাড়ী দেখতে এলে বুঝি?" স্মিতহাস্যে অনিলা বলিল "গাড়ী ত আমাদের বাড়ীর উঠোন থেকেই দেখা যায়।"

"তবে কি জল নিতে, ঘটী কৈ?"

"এই ভরসন্ধে বেলায় বুঝি কেউ জল খায়?" এই বলিয়া অনিলা তাহার আঁচলের গেরোটা খুলিয়া বড় বড় দুটো বেগুন বহির করিয়া বলিল "আমাদের গাছে হয়েছিল, বাবা পাঠিয়ে দিলে।" বেগুন দুটোর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়া বলিলাম "তাত দিলে কিন্তু অত শত কেটে কুটে রান্না করে কে?

বিস্মিতের মত অনিলা বলিল "ওমা বেগুন কুটতে পারেন না বুঝি? আচ্ছা আমি কুটে দিচ্ছি" এই বলিয়া অনিলা আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ঘরের দিকে যাইবার জন্য পা বাড়াইল। হাতের বইখানা চেয়ারের উপর উল্টাইয়া রাখিয়া আমিও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলাম। ঘরটার চতুর্দ্দিকে

সচকিতে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অনিলা বলিল "কৈ দিন ত আপনার বঁটীখানা কোথায় আছে।" তাহাকে বলিলাম "থাক অনিলা, তোমার আর অত কষ্ট করতে হবে না।" "না না কষ্ট আর কি, দিন না সত্যি।" তাহার কণ্ঠে ক্ষুদ্র বালিকার মত কেমন একটা বায়না করা মিনতি।

তরকারির ঝুড়িটা থেকে ছুরীখানা বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম "এই আমার কুটনো-কোটা বঁটী।"

"বাঃ বেশ বঁটীখানি ত, যান্ আপনি বাহিরে বসে পড়ুন গিয়ে, আমি কুটনো কুটছি।" এই বলিয়া সে কুটনো কুটিতে বসিয়া গেল, আমিও বাহিরে আসিয়া পুনরায় পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অনিলা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল "শুধু ঝোলের কুটনোটা কুটে দিলুম, আমি এবার যাই অনেক্ষণ এসেছি।"

মুখ তুলিয়া বলিলাম "ভাতটাও কেন রেঁধে দিয়ে গেলে না?" "বামুনরা বুঝি কখনও শুদ্দুরদের হাতে ভাত খায়? এই বলিয়া সে এক সুকুমার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে মাঠের বুকে নামিয়া গেল। মাঠে তখনও সপাসপ শব্দে ধান ঝাড়া চলিতেছে।

তাহার পর চার পাঁচদিন আর অনিলার সহিত দেখা হইল

না। সম্ভবতঃ সে এই কয়দিন মাঠে আসে নাই, আসিলে নিশ্চয়ই একবার ষ্টেশনের দিকে আসিত।

বসিয়া বসিয়া হেঁটমুখে টিকিট বিক্রয়ের হিসাব পত্র মিলাইতে ছিলাম, এমন সময় দরজার নিকট খুট করিয়া একটা শব্দ হইতে মুখ তুলিয়া দেখি দুয়ারের আংটা ধরিয়া অনিলা আমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম "এই যে—এ কয়দিন আর মাঠে আসনি বুঝি ?"

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিলা উত্তর দিল "না, বাবার অসুখ করেছে কি না।"

"কার অসুখ, মড়লের ? কি হয়েছে ?"

"জ্বর, বুকে সর্দ্দি, আজ একটু ভাল আছে।"

অনিলা বেশিক্ষণ দাঁড়াইল না, যাইবার সময় বলিয়া গেল কাল থেকে মাঠে আর কেহ আসিবে না, ধান ঝাড়া সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব সেও আর মাঠে আসিবে না। এ বছরের মত মাঠের সহিত তাহারও প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

দিন কয়েক পরের কথা।

সে দিন দুপুর বেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে একবার গ্রামের দিকে গেলাম। মোড়োলের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তাহার ছোট ছেলেটীর সহিত দেখা হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার বাবা কেমন আছে ?" বিনীতভাবে মোড়োলের ছেলেটী জবাব

দিল "সেই একই রকম বাবু, বুকের যন্ত্রণাটা আরও বেড়েছে।"

তাহাকে বলিলাম "চল তোমার বাবাকে দেখে আসি।"

"আসুন না" বলিয়া সে অতি আগ্রহের সহিত আমায় বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

তক্তোপোষের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করিয়া মোড়োল মুদিত চক্ষে চুপটী করিয়া শুইয়া আছে। পাশে বসিয়া অনিলা পিতার বুকে ধীরে ধীরে মালিস করিতেছে। মুখখানি তাহার ঈষৎ শুষ্ক। আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে সে সচকিত হইয়া একটু নড়িয়া বসিল। মোড়োলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন আছ মোড়োল?" চক্ষু উন্মীলন করিয়া মোড়োল আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া উদগ্রীব কণ্ঠে বলিল "কে মাষ্টার বাবু?"

"হ্যাঁ, কেমন আছ তুমি?"

"আর থাকা থাকি বাবু, এবার গেলেই হয়।" তাহার কণ্ঠস্বরে এক অনন্ত বেদনার সুর। মোড়োলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম যে তাহার কোন ভয় নাই, শীঘ্রই সে সারিয়া উঠিবে। আমার কথায় তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটুখানি নিরস নিঠুর শুষ্ক হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল "না বাবু এ বয়সে আর মরবার ভয় নেই, ভাবনা শুধু ঐ পোড়াকপালী মেয়েটার জন্য; আমি মরে গেলে ওর যে

কি হবে ? মোড়োলের স্তিমিত চক্ষু দুইটী অন্তরের এক অপরি-হার্য্য বেদনায় যেন চক্ চক্ করিয়া উঠিল। পাশে বসিয়া পিতার রুগ্ন কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনিলা বলিল "এবার তোমার দুধটা নিয়ে আসি বাবা, সেই ত কোন সকালে খেয়েছ।" "যা মা যা" এই বলিয়া মোড়োল সস্নেহে দু' আঙ্গুলে অনিলার গালটা টিপিয়া ধরিল।

অনিলা চলিয়া গেলে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্বশুর বাড়ীতে ওর কে আছে ?"

ব্যথিতকণ্ঠে মোড়োল বলিল "নেই কেউই, যায়গা জমি সব বিলি করা আছে, আমার ছেলেরা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা শোনা কোরে আসে।"

মোড়োলের মুখে শুনিয়াছিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী একটী গ্রামে অনিলার শ্বশুর বাড়ী, সেখানে কিছু ধান জমি, বিঘা পাঁচেকের একখানি বাগান ও পুকুর সমেত ছোট একখানি বসতবাড়ী আছে। মোড়োলের বড় ছেলের শ্বশুর বাড়ীও ঐ গ্রামে, অনিলাদের বাড়ীর কাছেই।

দুধের বাটীটা হাতে করিয়া অনিলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দুধটুকু পান করিয়া অনিলাকে উদ্দেশ করিয়া মোড়ল বলিল "তুমি ও ঘরে একটু শোও গিয়ে মা, আমি ততক্ষণ মাষ্টার বাবুর সঙ্গে দুটো গল্প করি।" সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া

অনিলা শূন্য দুধের বাটীটা হাতে করিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

অনিলা চলিয়া গেলে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মোড়োল আকস্মিক এক অভাবনীয় প্রশ্ন করিয়া বসিল "আচ্ছা মাষ্টার বাবু আজ কাল ত আখছার বিধবা বিয়ে হচ্ছে, কোন রকম কোরে অনিলার বিয়ে দেওয়া যায় না?"

আজকালকার দিনে যদিও ঐরূপ পরিকল্পনা একেবারে অবাস্তব নয় এবং চেষ্টা করিলে হয়ত সল্পায়াসসাধ্য, তবুও মোড়োলের মত একজন পল্লীগ্রামবাসী গতানুগতিক পন্থী পুরাতন লোকের মুখে স্বকন্যার বিধবা-বিবাহ দিবার কথা শুনিয়া আমাকে একটু বিস্মিত হইতে হইল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কতকটা আপন মনে মোড়োল বলিতে লাগিল "আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি মেয়ে জামাইয়ের নামে লেখা-পড়া কোরে দেব, তা ছাড়া অনিলার মা'র গয়নাগুলো সব ওই পাবে।"

মোড়োলকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে তুমি এ গাঁয়ে একদিনও টিক্‌তে পারবে মোড়োল?"

"ম্লান হাসিয়া মোড়োল বলিল, "আমার আর ক'টা দিনই বা বাবু?"

"কিন্তু তোমার মেয়ে জামাইতো রইল, দু'দিন পরে যখন

তাদের ছেলে পুলে হবে তাদের বিয়ে থা দেওয়া আছে—"

"ততদিন হয় ত গাঁয়ের লোকেরা বুঝতে পারবে যে ছ' বছর বয়সের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি কিছু অন্যায় কাজ করিনি।" শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে মোড়োল জবাব দিল।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া মোড়োলের কথাটা ভাবিতে লাগিলাম।

মোড়োল বলিল "বাবু, অনিলার এ দশা হবার পর থেকে ভগবানকে কত ডেকেছি—হে ঠাকুর তুমি আমায় নাও কিন্তু এখন ভাবছি অনিলাকে এ অবস্থায় রেখে গেলে স্বর্গে গিয়েও আমায় চোখের জল ফেল্‌তে হবে।" বৃদ্ধের কোটরপ্রবিষ্ট দুইটি চক্ষের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু দানা বাঁধিয়া উঠিয়া ছিঁড়িয়া পড়া মুক্তার মত শীর্ণ দুইটি গাল বহিয়া বিছানার উপর টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই ধরণের দুঃখ বেদনায় সান্ত্বনা দিবার ভাষা সব সময়ে মনের মধ্যে জোগাইয়া ওঠে না। চুপটি করিয়া বসিয়া মোড়োলের কপালের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ক্রমশঃ বেলা গড়াইয়া আসিতে লাগিল। অদূরে থানার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। সময়মত আর একদিন আসিব বলিয়া মোড়োলের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। ঘরের

বাহিরে আসিয়া উঠানে পা দিবামাত্র কোথা হইতে অনিলা বলিল "আবার আস্‌বেন।" এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখি উঠানের একপাশে বাঁশের একটী মাচার উপর যেখানে ঘন বিন্যস্ত কয়েকটি লাউএর গাছ পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া পাতায় পাতায় জায়গাটির উপর বাঁকাচেরা একটুখানি ছায়াপাত করিয়াছে তাহারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অনিলা আমার দিকে চাহিয়া আছে। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম যে আবার আসিব।

তাহার পর দিন পনের কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আর একদিন অনিলাদের বাড়ী গিয়াছিলাম, অনিলা বাড়ী ছিল না। মোড়োলের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে নামিয়া আসিতেছে। বুকে অসহ্য বেদনা, কথা কহিতে কষ্ট হয়।

সেদিন রাত্রে অকাতরে ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ হরিবোল দেওয়ার শব্দে আচমকা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকে অতল নিশুতির মধ্যে আকস্মিক এই ভয়ঙ্কর হরিধ্বনি শুনিয়া একটা অননুভূত আশঙ্কায় আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বালিসের তলা হইতে দেশালাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিলাম। আবার সেই "বল হরি হরিবোল।" ছেঁ্যৎ করিয়া মোড়লের কথা মনে পড়িয়া গেল; লোকটা কেমন আছে কে জানে?

পরদিন সকাল বেলায় ষ্টেশনের পোর্টারটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গতকল্য রাত্রি বারটার সময় মোড়োল মারা

গিয়াছেন। অনিলার কথা মনে পড়িল। মাতৃপিতৃহারা আশৈশব স্বামী-সোহাগ-বঞ্চিতা অভাগিনী অনিলা! কিন্তু তবুও সে ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের একটী মাত্র ভগ্নি।

মহাসমারোলে মোড়োলের শ্রাদ্ধ শান্তি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রাদ্ধবাসরে 'বিরাট পাট' হইতে আরম্ভ করিয়া সুকণ্ঠি কীর্ত্তনীয়ার বিরহ সঙ্গীত পর্য্যন্ত কিছুই আর বাদ পড়িল না। সর্ব্বশেষে এক-দিন কাঙালী ভোজনও করান হইল। গ্রামের সকলে একবাক্যে মোড়লের পুত্র চতুষ্টয়ের প্রশংসা করিয়া বলিল "হ্যাঁ ছেলের মত ছেলে বটে।"

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন সকাল বেলায় দাতন করিতে করিতে ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে পায়চারী করিতেছি এমন সময় দেখি একটা শিশি হাতে করিয়া অনিলা রেলওয়ে ক্রসিং পার হইয়া ওপারে যাইতেছে। সঙ্গে একটী প্রৌঢ়া বয়সী বিধবা স্ত্রীলোক। আমাকে দেখিয়া অনিলা বলিল "খুব সকাল বেলায় উঠেছেন যে দেখছি।" তাহার কণ্ঠস্বরে চরিত্রগত বেশ একটা শান্ত সংযত ভাব। সর্ব্বাঙ্গে বেশ একটা প্রশান্ত অথচ প্রদীপ্ত যৌবনশ্রী।

জিজ্ঞাসা করিলাম "এত সকালে কোথায় যাচ্ছ অনিলা?"

"চণ্ডীতলার কলেজে। আজ ক'দিন থেকে বড্ড জ্বরে ভুগছি কি না?"

"চণ্ডীতলা ? সেত অনেকটা।"

হাসিয়া অনিলা বলিল "আমরা চাষি-ভুষি লোক মাষ্টার বাবু, আমাদের পথ চলা অভ্যাস আছে।"

মোড়োলের মত অবস্থাপন্ন লোকের মেয়েকে যে একদিন রোগজীর্ণ দুর্ব্বল দেহ লইয়া একক্রোশ দূরে দাতব্য হাঁসপাতালে দীনহীন কাঙালের মত ঔষধ আনিতে যাইতে হইবে ইহা কখনও কল্পনা করি নাই। তার ছেলেদের ঘরে এখনও গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, সংসারের বেশ স্বচ্ছল অবস্থা। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অনিলা বলিল "আচ্ছা এখন যাই, আসবার সময় আবার হয়ত দেখা হবে।" এই বলিয়া অনিলা আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

কথায় কথায় সেদিন ষ্টেশনের পোর্টারটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মোড়োলদের বাড়ীর খবর কি রে ?"

পোর্টারটা স্থানীয় লোক। আমার কথার উত্তরে সে বলিল "আর বলবেন না বাবু ওদের কথা, চার ভায়ে আলাদা হয়েছে বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ওদের ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি চলছে, সংসারটা একেবারে ছারখার হয়ে গেল।" ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, সংসারে নিত্য যাহা ঘটে হয় ত বা ইহা তাহারই একটা পরিচ্ছেদ। একটু থাকিয়া পোর্টারটা বলিতে লাগিল "মুস্কিল হয়েছে মোড়োলের মেয়েটার ; ভাগের

বোন, কেউ একা তার ভার নিতে চায় না, সবাই বলে—আমি ছাপোষা লোক, কোথায় পাব।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কার সংসারে সে আছে?"

"দিন কয়েক এর ঘরে দিন কয়েক ওর ঘরে এই কোরে সে কাটাচ্ছে। জ্বরে ভুগে ভুগে মেয়েটার অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে, এক ফোঁটা ওষুধও পড়ে না পেটে, তার ওপর ঐ রোগা শরীরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।"

"সে কিরে, অনিলা যে ওদের মায়ের পেটের বোন।"

"তাহলে কি হয় বাবু, বৌ-এরা হচ্ছে বাড়ীর কর্ত্তা, ননদ ত আর তাদের মায়ের পেটের বোন নয়।"

একটুখানি ভাবিয়া বলিলাম "এখন ওর পক্ষে সব চেয়ে ভাল শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে থাকা,—হাজার হোক্ স্বামীর ভিটে।"

ঈষৎ বিস্মিত সুরে পোর্টার বলিল "তা জানেন না বুঝি, বাপের কাজের সময় মোড়োলের বড় ছেলে যে সেখানকার সব বেনামীতে কিনে নিয়েছে।"

অবাক্ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম "কি রকম?"

"তখন বড় ছেলে ছিল বাড়ীর কর্ত্তা, বাপের কাজের সময় সে বল্লে, হাতে টাকা নেই, সম্পত্তি কেনবারও খদ্দের জুটছে না। ঠিক এই সময়ে তার এক সম্বন্ধি এসে বল্লে, অনিলা যদি তার

বিষয়টা বিক্রী করে—তাহ'লে সে কিনতে রাজী আছে—তার বাড়ীর কাছেই কি না। অনিলাও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বড় ভায়ের সম্বন্ধীকে সব বিক্রী কবলা কোরে দিলে।"

মোড়োলের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যগুলি একটীর পর একটী করিয়া আমার চোখের সম্মুখে বায়স্কোপের ছবির মত জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বড়লোকী দান-সামগ্রী আত্মীয়-কুটুম্বের সরগরমে শ্রাদ্ধ বাড়ীর সেই উৎসব-সমারোহ, কীর্ত্তন গান। বিধবা মেয়ের বিষয় বিক্রীর টাকায় স্বর্গে গিয়া মোড়োল হয় ত মাটীর পৃথিবীর দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া একটা গভীর দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল।

ইহার পর মাস পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে। মোড়োলের ছেলেদের বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছে। ঠিক হইয়াছে অনিলা প্রত্যেক ভায়ের সংসারে বছরে তিন মাস করিয়া থাকিবে।

ন'টা বাহান্নর লোকালখানার আগমন প্রতীক্ষায় সে দিন সকাল বেলায় আমি অভ্যাসমত ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে পায়চারী করিতেছিলাম এমন সময় গ্রামের দিক হইতে একখানা গরুর গাড়ী আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়োয়ানের পিছনে মোড়োলের ছোট ছেলেটিকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হে কোথায় যাবে?"

গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ছেলেটী বলিল "হাঁসপাতালে যাচ্ছি, অনিলাকে নিয়ে—

"হাঁসপাতালে? অনিলাকে নিয়ে? কেন অনিলার কি হয়েছে?" ছেলেটী বলিল, ক্রমাগত জ্বরে ভুগিয়া অনিলার অবস্থা বর্ত্তমানে অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দেহে রক্ত নাই। শরীর এত দুর্ব্বল যে বিছানা হইতে উঠিতে পর্য্যন্ত পারে না। তাই ডাক্তারের উপদেশ মত সে অনিলাকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দিতে যাইতেছে।

দূরে ট্রেণের শব্দ শোনা গেল। আমার তখন আর সেখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অবসর ছিল না। ট্রেণখানাকে বিদায় করিয়া দিবার জন্য আমি প' পা করিয়া ষ্টেসন ঘরের দিকে গেলাম।

খানিক পরে, ট্রেণখানা চলিয়া গেলে আমি গেটের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখি, অনিলাদের গরুর গাড়ীখানা লাইন পার হইয়া মাঠের পথে নামিয়া পড়িয়াছে। একবার ভাবিলাম গাড়ীখানাকে দাঁড় করাইয়া অনিলার সঙ্গে দুটো কথা কহিয়া আসি কিন্তু জানিনা কেন, পরক্ষণেই একটা নিস্ফল আপশোষ আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। যে যাইতেছে তাহাকে পিছু ডাকিয়া আর লাভ কি? দেখিতে দেখিতে আমার চোখের উপর দিয়া তাহাদের গরুর গাড়ীখানা দূরে গ্রামের পথে নির্জ্জন বনান্তরালে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই খানেই এই গল্পের পরিসমাপ্তি, পরিশিষ্টে একটুখানি আছে।

তাহার পর যাহা হইয়াছিল এক কথায় তাহা বলি—

দিন কয়েক পরে একদিন সকাল বেলায় কোন কারণে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে মোড়লের বাড়ীর নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইলাম বাড়ীর ভিতরে কে মেয়েলী গলায় বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে "ঠাকুর-ঝি তুমি ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেলে গো ?"

মানুষের অন্তর্বেদনা মৃত্যুর পরপারে গিয়া পৌঁছায় কি না কে জানে ?

কল্যাণী

অনেকদিন হইতেই ইচ্ছা ছিল এবার পূজার ছুটীতে দেশে আসিয়া বসিয়া নিশ্চিন্তমনে একটি গল্প লিখিব। সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত অনাড়ম্বর একটি কাহিনী, হয়ত একটি উপেক্ষিতা পল্লীবধূ শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা শুনিতে শুনিতে সারাদিন মুখটি বুজিয়া সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করিয়া যায়, আর রাত্রে সপরিবারটিকে সন্তর্পণে আড়াল করিয়া অপ্রচুর প্রদীপের আলোয় প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসে। এমনিতর একটি বেদনা-ব্যথাতুর জীবনের অনুক্ত ইতিহাস, সকল সময়ে যাহা চোখে পড়ে না, অথচ মন যাহাতে অনন্তকালের জন্য সায় দেয়, তাহারই একটি বিস্তৃত বিবরণ কালীকলমে লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া—অনুরূপ একটি অভিলাষ অনেকদিন হইতেই আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া ছিল।

সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ীর সম্মুখে প্রাচীন অশত্থগাছটার নীচে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া এমনিতর একটি অদৃশ্য ভাবকল্পনায় বিভোর

হইয়া ছিলাম, এমন সময় একটি পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে মুখ তুলিয়া দেখি, আধসেরি একটা ঘটি হাতে করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাঝের পাড়ার অঘোর পিসী। অঘোর-পিসীর ছেলে গোষ্ঠ ছিল বাল্যকালে আমার পাঠশালার সহপাঠী, সেই সুবাদে আমি দেশে আসিলেই সে আমাকে এক ঘটি করিয়া দুধ দিয়া যায়।

ঘটিটা আমার সম্মুখে বসাইয়া রাখিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "বাবাকে যে বড্ড রোগা দেখাচ্ছে এবারে ?"

বয়স হইয়াছে বলিয়া হয়ত অঘোর-পিসীর চোখে ছানি পড়িয়াছে তাই আমার এই নধর পরিপুষ্ট চেহারাখানিকে দেখিয়া অঘোর-পিসী রোগা ঠাওরাইতেছে, কিন্তু তবুও তাহার কথার সুরে এমন একটি আন্তরিকতার টান ছিল, যাহা শুনিলে সাধারণতঃ মানুষের মন একটুখানি সহানুভূতি লাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। কতকটা আক্ষেপের সহিত বলিলাম, "আর যে খাটুনি পড়েছে পিসী।"

আমার কথাটার পূর্ব্বানুবৃত্তি করিয়া অঘোর-পিসী বলিল "তার ওপর আবার বারমাস হোটেলে খাওয়া, এ কি আর ভদ্দরলোকের শরীরে সয় গা ?"

মেসে থাকিয়া কলিকাতায় আমি স্কুলমাষ্টারী করি। অঘোর-পিসী পল্লীগ্রামের লোক, "মেস" শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহার

জানা নাই। সেখানকার খাওয়া-দাওয়া বাড়ী অপেক্ষা ভাল হয়। কথাটা অঘোর পিসী বিশ্বাস করিল কিনা জানি না, একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল,"হ্যাঁগা বাবা, তুমিও ত কলকাতায় থাক, আমাদের গোষ্ঠর সঙ্গে দেখা হয় না ?"

শুনিয়াছিলাম বটে, কালিঘাট অঞ্চলে ঐ দিকে কোথায় গোষ্ঠর শ্বশুরবাড়ী। শাশুড়ী-বৌএ বনিবনা হয় না, গোষ্ঠর স্ত্রী চিরকাল বাপের বাড়ীতেই থাকে। প্রথম প্রথম গোষ্ঠ দেশের বাড়ীতেই থাকিত। সম্প্রতি মাস আষ্টেক হইল সেইখানকার একটি ঢালাইয়ের কারখানায় তাহার চাকরী হওয়ায়, সেও শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছে।

অঘোর-পিসীকে জানাইলাম যে, গোষ্ঠর সঙ্গে আমার দেখা হয় না বটে, তবে ঠিকানা দিলে সময়মত একদিন গিয়া না হয় দেখা করিয়া আসিতে পারি। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অঘোর-পিসী বলিল, "সেই যে গা বাবা বাজারের কাছে হলুদে রঙের বাড়ীখানা, একেবারে বড় রাস্তার ওপরে বল্লেই হয়।"

অঘোর-পিসীর মত লোক—জীবনে যাহারা কদাচিৎ সহরের মুখ দেখিয়াছে, সহরের পথঘাট সম্বন্ধে তাহাদের ইঙ্গিত একেবারে অস্বাভাবিক নয়। একটুখানিক চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে অঘোর-পিসী বলিল, "সেবারে কালীঘাটে মাকে দর্শন করতে গিয়ে ওদের বাড়ী ছিলুম কি না এক রাত্তির।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা রাস্তাটার নাম কি?"

নিঃসংশয়ে অঘোর-পিসী বলিল, "কালীঘাট বাজারের রাস্তা, সে তুমি সেখানে গেলেই দেখতে পাবে বাবা, হলদে রঙের দোতালা বাড়ী, সামনেই দেখবে একটা কালো ষাঁড় শুয়ে আছে।"

কি খেয়াল গেল জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা পিসী, গোষ্ঠ কি ঘর-বাড়ী ছেড়ে চিরকাল শ্বশুর-বাড়ীতেই বাস করবে?"

উদাস কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "কি জানি বাবা ছেলে-মানুষটী ত নয়, যে বুঝিয়ে বলব?" কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত দানা বাঁধিয়া উঠিল। ঈষৎ বিকৃত স্বরে বলিল, "মা হয়ে আমি কি কখনও থাকতে পারি গা বাবা, এমন করে?"

অঘোর-পিসীর তিনটি সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ গোষ্ঠই যা এখন জীবিত। প্রথম দুইটির একটিকে ষোল বছরের ও অপরটিকে বার বছরেরটি করিয়া নিরুপায়ের মত তাহাদের সে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। বিধবা হইবার পর গরু পুষিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী দুধ বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে অঘোর-পিসী নাবালক গোষ্ঠকে মানুষ করিয়াছিল, বড় হইয়া সেও এখন পরের মত বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর সহিত মার বনিবনাও হয় না বলিয়া গোষ্ঠর মা হইয়াছে পর, আর শ্বশুর-বাড়ী হইয়াছে আপন।

অঘোর-পিসীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "কিছু ভেব না পিসী, গোষ্ঠ তোমার ভালই আছে।" অঞ্চল-প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া অঘোর-পিসী বলিল, হতভাগাটা যদি মাঝে মাঝে একখানা করে চিঠিও দেয় তাহলে আমাকে আর এমন করে পথে পথে কেঁদে বেড়াতে হয় না। চারখানা চিঠি দিলুম গা বাবা, তার একখানারও কি জবাব দিতে নেই ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলে ?"

"কেন, কালীঘাট বাজারের রাস্তা, গোষ্ঠর শ্বশুরের নামে, সে সব ঠিকই লিখেছিলুম শুধু—আমার এইখানটা", বলিয়া সে এই হাত দিয়া নিজের কপালখানা আমায় দেখাইয়া দিল।

ঠিকানা ভুল হইয়াছে বলিয়াই হয়ত অঘোর-পিসীর চিঠি গোষ্ঠর নিকটে গিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু গোষ্ঠর ত আর ঠিকানা ভুল হইবার কথা নয়, ইচ্ছা করিলে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাকে একখানা চিঠি লিখিতে পারে না ?

একথা সেকথা কহিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে অঘোর-পিসী বিদায় লইল। পুনরায় আমি গল্প লেখায় মনসংযোগ করিলাম। কিন্তু যত বারই আমি মনের মধ্যে সেই কল্পচারিণী গ্রাম্য বধূটীর ছবি পরিকল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম, ততবারই আমার মনে শুধু পড়িল অঘোর-পিসীর সেই ব্যথিত পাণ্ডুর মুখখানি—তাহার

বেদনাবিচলিত কণ্ঠস্বর, "মা হয়ে কি আমি থাকতে পারি গা বাবা এমন করে ?" আমার সৌখীন কল্পনা-বিলাস যেন সত্যকারের আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ পাইয়া বিভিন্নভাবে এক গোচরীভূত বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়া গেল

দিন চার পাঁচ পরের কথা। আহারাদির পর সেদিন দুপুর বেলায় ঘরের মধ্যে শুইয়া পুরাতন একখানা ইংরাজী পত্রিকার পাতা উল্টাইতে ছিলাম, এমন সময় খোলা দরজা দিয়া অঘোর-পিসী আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এরূপ অসময়ে তাহাকে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলাম, "কি গা পিসী ?" ঈষৎ হাসিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "এত দিন বুঝি ছেলের আমার মনে পড়ল মাকে," এই বলিয়া সে কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল "পড়ত গা বাবা, হতভাগাটা কি লিখেছে।"

চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলাম, গোষ্ঠর চিঠি নয়। বছর দুই পূর্ব্বে সে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জনৈক স্যাকরার নিকট ধারে কয়েকখানি গহনা গড়াইয়াছিল, তাহারই দরুণ সে এখনও গোষ্ঠর কাছে কিছু পায়, উক্ত টাকার তাগাদা করিয়া এই চিঠিতে সেই স্যাকরাটি লিখিয়াছে যে, চিঠি পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে টাকা শোধ না দিলে সে নালিশ করিয়া তাহার পাওনা টাকা

আদায়ের ব্যবস্থা করিবে। চিঠিখানা আগাগোড়া অঘোর-পিসীকে পড়িয়া শুনাইলাম। ইতিপূর্ব্বে চিঠিখানা পাইয়া তাহার মুখে যে একটুখানি আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চিঠির বক্তব্য শুনিয়া সেই হাসিটুকু যেন অপরাহ্ণের হঠাৎ মিলাইয়া যাওয়া শেষ রৌদ্রের মত এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিস্মিত সুরে অঘোর-পিসী বলিল, "ওমা দেখেছ তলে তলে বৌ-এর গহনা গড়ান হয়েছে, বোঝ এবার দেবে'খন ওরা নালিশ ঠুকে।" বলিলাম "কাউকে দিয়ে চিঠিখানা গোষ্ঠর কাছে পাঠিয়ে দিলে হয় না পিসী?"

"কার খোসামোদ করতে যাব বাবা, মরুকগে যেমন কর্ম্ম তেমন ফল", এই বলিয়া সে অনেকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ঘরের রোয়াকে বসিয়া ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া গল্পের প্লট চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া অঘোর-পিসী আসিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রোয়াকের নীচে দাঁড়াইয়া আঁচলের গেরো হইতে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ বাহির করিয়া বলিল, "দেখত বাবা, লেখাটা ঠিক হয়েছে কি না?" তাহার হাত হইতে কাগজখানা লইয়া ভাঁজ খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, পার্শ্ববর্ত্তী সেই স্যাকরাটি তাহার পাওনা টাকা সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া রসিদ

লিখিয়া দিয়াছে। অঘোর-পিসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বুঝি টাকাটা দিয়ে এলে ?”

”না দিয়ে বা থাকি কি করে বল, পেটে যখন ধরেছি··· ।” অঘোর-পিসীর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বর যেন অন্তরের এক অপরিহার্য্য বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। পেটে না খাইয়া দৈনিক নানারূপ দুর্ভোগ সহ্য করিয়া অতি কষ্টে বুড়ী হয়ত ঐ টাকা কয়টি তাহার অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সন্তানের এই সামান্য বিপদের কথা শুনিবা মাত্র অস্থির হইয়া সে তাহার দরিদ্র্যসঞ্চিত অর্থগুলি সব পুত্রবধূর অঙ্গদ্রব্যের বিলাস-যজ্ঞে আহুতি দিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। মা সন্তানকে শুধু স্নেহ দিয়া মানুষ করে বলিয়া নয়, সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমনি করিয়া বুক পাতিয়া দেয় বলিয়াই, মায়ের গৌরবগাথা সমগ্র জনমনের বার্ত্তায় ব্যক্ত। কাগজখানা অঘোর-পিসীর হাতে ফিরাইয়া দিলাম “একদিন কালীঘাটে গিয়ে গোষ্ঠকে কেন দেখে এস না পিসী।” অঘোর-পিসী জবাব দিল, “কার সঙ্গে যাব বাবা, সহরের পথ ঘাট ত আমার চেনা নেই।”

“আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি পিসী, এখানে ত আমার বিশেষ কোন কাজ নেই।”

অধীর আনন্দে অঘোর-পিসী বলিল,“তা হ’লে কালই

কেন চল না বাবা, আহা বাছাকে আমার কত দিন দেখিনি।”

বলিলাম, “বেশ তাই চল।”

কিন্তু দুর্ভাগ্য অঘোর-পিসীর। পরদিন কালীঘাটে গোষ্ঠর শ্বশুর-বাড়ী গিয়া তাহাদের বাড়ীর নীচেকার ভাড়াটেদের কাছে জানা গেল, পূজার ছুটিতে গোষ্ঠ তাহার শশুর-শাশুড়ীকে লইয়া কাশী বেড়াইতে গিয়াছে, কবে ফিরিবে তাহা সঠিক তাহারা বলিতে পারে না।

ফিরিয়া আসিতে আসিতে অঘোর-পিসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে পিসী?”

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, “না থাক্‌গে, সেবার এসে ওসব দেখে গেছি।”

তাহার কাছে কলিকাতায় দেখিবার মত আরও গোটা কয়েক বস্তুর নাম করিলাম, কিন্তু কোনটাতেই সে তেমন আগ্রহ দেখাইল না। অবশেষে বলিল, “তোমার যদি দেখবার ইচ্ছে হয়ে থাকে বাবা, তুমি যাও না কেন, আমি ততক্ষণ মন্দিরে বসে একটু জপ করি।” হাসিয়া তাহাকে জানাইলাম যে, আমার নিজের সে ইচ্ছা নেই, কলিকাতায় ঐ সব দ্রষ্টব্যগুলি আমার নিত্য দেখার সামিল হইয়া গিয়াছে।

ফিরিবার পথে হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া দূরগামী একখানা

ট্রেণে একদল যাত্রীকে বাক্স-বিছানা লইয়া ওঠা নামা করিতে দেখিয়া অঘোর-পিসী জিজ্ঞাসা করিল "ওখানা বুঝি কাশীর গাড়ী।"

অঘোর-পিসীর মুখে কাশীর নামটা শুনিয়া তাহার উপর আমার কেমন একটা অদ্ভুত মমত্ববোধের সৃষ্টি হইল। তাহার পেটের ছেলে গোষ্ঠ গেল শ্বশুর-শাশুড়ীকে লইয়া তাহাদের তীর্থধর্ম্ম করাইতে, আর বুড়ী মা যে তাহাকে এত করিয়া মানুষ করিল, সে মৃত কি জীবিত তাহারও একটা খোঁজ-খবর লইবার প্রয়োজন মনে করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "পিসী, তুমি যাবে একবার কাশীতে?"

ম্লান হাসিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "বুড়ো মানুষ পেয়ে বাবার বুঝি ঠাট্টা হচ্ছে?" "না পিসী ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি, আমার ত এখনও অনেক ছুটী রয়েছে, চল না কাশী বেড়িয়ে আসা যাক?"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অঘোর-পিসী বলিল, "বাবা আমরা গরীব মানুষ, দূর দেশে গিয়ে তীর্থ-ধর্ম্ম করবার মত ক্ষেমতা আমাদের নেই, শ্বশুরের ভিটেই আমার কাশী-বৃন্দাবন, সেই ভিটেতে রোজ সন্দে বেলায় সন্দে দেখানই আমাদের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম।

অঘোর-পিসীর কথা শুনিয়া আমার চোখের সম্মুখে গোটা ভারতবর্ষের একখানি নিখুঁত ছবি ফুটিয়া উঠিল। অহল্যা,

দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা প্রভৃতি পুণ্যশীলা মহিয়সী নারীগণ আজ এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া না থাকিলেও, বিস্মৃত বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই ভারতের মাটীতে একদিন তাঁহারা যে বীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহারই অঙ্কুর গজাইতেছে অঘোর-পিসীর মত তাহাদের শত শত বংশধরগণের নিভৃত অন্তরে।

ইহার মাসখানেক পরে কলিকাতায় একদিন আকস্মিক গোষ্ঠর সঙ্গে দেখা। ভবানীপুরের দিকে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতেছিলাম, হঠাৎ পিছন হইতে কাহাকে আমার নাম ধরিয়া দাদা দাদা করিয়া ডাকিতে শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি অঘোর-পিসীর ছেলে গোষ্ঠ। হাতে তাহার একটা ঘিএর টিন, পিছনে মুটে মাথায় এক ঝুড়ি তরি-তরকারি। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খবর রে গোষ্ঠ? খুব যে বাজার করেছিস দেখছি।"

"এই যে দাদা, বাড়ীতে বামুন-ভোজন আছে কি না—তাই।"

"বামুন-ভোজন কিসের রে, কারও শ্রাদ্ধ না কি?

হাসিয়া গোষ্ঠ বলিল, "না শ্রাদ্ধ নয়, শ্বশুর-শাশুড়ী কাশী-গয়া করে এলেন কি না, তাই বাড়ীতে কাল দ্বাদশটি বামুন খাবে।"

তাহাকে তাহার মায়ের সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া দেশে গিয়া একবার বুড়ী মাকে দেখা দিয়া আসিতে বলিলাম। বাড়ী যাইতে সম্মত হইয়া গোষ্ঠ বলিল, "আমার কি আর অসাধ দাদা যে বাপ-পিতামহ ভিটেতে গিয়ে বাস করি, কিন্তু কি করব বল, ঐ

একটা মাত্তর বৌ, মা আমার তাকে নিয়ে দুদিন ঘর করতে পারলে না," এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া আবার বলিল, "তাও বললুম দিন কতক না হয় এখানে এসেই থাক। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী খুব অমায়িক লোক, কোন কষ্ট হবে না। তা মা আমার তার শ্বশুরের ভিটে ছাড়া কোথাও থাকতে রাজি নয়। আমি আর কি বলব বল ?"

গোষ্ঠকে বলিলাম যে, তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। শুধু যেন সে মাঝে মাঝে বাড়ী গিয়া বুড়ী মাকে একবার করিয়া দেখা দিয়া আসে।

ইহার দিন কয়েক পরে একদিন শনিবার দেশের ষ্টেশনে নামিয়া গ্রামের পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে অঘোর-পিসীর বাড়ীর নিকট আসিয়া কি খেয়াল গেল' তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উঠানে দাঁড়াইয়া অঘোর-পিসীর নাম ধরিয়া ডাকিতে ঘরের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, "কে গো ?" "আমি গো পিসী" বলিয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি মেঝের উপর খান কয়েক থলে বিছাইয়া অঘোর-পিসী আগাগোড়া একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, "এস, এস বাবা, জ্বরটা আজ যেন একটু বেশী হয়েছে, কিছুতেই আর বসতে পাল্লুম না।" তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলাম জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। মাথার উপর আলগা করিয়া হাত

বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম "জল-পটী দেব পিসী ?"

"না বাবা, ও ম্যালেরিয়া জ্বর আপনিই সেরে যাবে," এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

একথা সেকথা কহিতে কহিতে গোষ্ঠর কথা উঠিলে জিজ্ঞাসা করিলাম "গোষ্ঠ এসেছিল না কি ?"

ব্যগ্রভাবে অঘোর-পিসী বলিল "কৈ না, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি ?"

বলিলাম "হ্যাঁ।"

"কি বললে ?"

"বলেছিল শীগ্‌গিরই সে আসবে।"

"তা হলে সে নিশ্চয়ই আসবে, ছেলে বেলার গোষ্ঠর আমার মা-অন্ত প্রাণ ছিল।" তাহার পর ঈষৎ থামিয়া অত্যন্ত খাটো গলায় অঘোর-পিসী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা বাবা, বৌমার পেটে কিছু হয়েছে শুনলে ?" হাসিয়া বলিলাম, "না তা কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, গোষ্ঠর ছেলে পুলে কি ?"

কতকটা আক্ষেপের সুরে অঘোর-পিসী বলিল, "পোড়া কপাল, ছেলেপুলে! আজ পাঁচ বছর হ'তে চলল বাধা বে দিয়েছি, ছেলেপুলে হবার নামটি নেই এখনও পর্য্যন্ত। সেবার কত করে বাবা পঞ্চাননের ফুল কাড়িয়ে মাদুলী করে দিলুম, তা বৌমা

আমার এমন লক্ষ্মীছাড়া-ঘরের মেয়ে যে, দুদিন পরতে না পরতেই কোথায় খুইয়ে এল।”

অঘোর-পিসীকে বলিলাম, “তোমার রোজ এই রকম জ্বর হচ্ছে পিসী, দিনকতক না হয় গোষ্ঠর কাছে গিয়ে—”

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, “ক্ষেপেছ বাবা, তার বৌ-এর মুখনাড়া খেতে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে থাকব আমি? আমার যা করে ঐ বাবা পঞ্চানন্দ।” এই বলিয়া সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া গ্রামের দেবতা বাবা পঞ্চাননের উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার করিতে লাগিল।

তখন নূতন কমলালেবু উঠিয়াছিল। খাইবার জন্য গোটা-কয়েক আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। পুঁটলী হইতে তাহার একটা বাহির করিয়া খোসা ছাড়াইয়া অঘোর-পিসীর মুখের কাছে এক কোয়া ধরিয়া বলিলাম, “নেবু খাও পিসী, খুব মিষ্টি নেবু।”

আমার হাতের দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্যে অঘোর-পিসী বলিল, “কমলানেবু বুঝি? কিন্তু ও ত আমার খাওয়া চলবে না বাবা। ফি বছর নবান্নর সময় নৈবিদ্যিতে নতুন চালের সঙ্গে পাঁচ রকম নতুন ফল ঠাকুরকে দিয়ে তবে আমি খাই। অসুখ-বিসুখে

এবছরে এখনও আমার নবান্ন করা হল না।" এই বলিয়া সে অতি সন্তর্পণে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা তখন গড়াইয়া আসিতেছিল। পাশের বাড়াতে শাঁখ বাজিয়া উঠিলে অঘোর-পিসী বলিল, "অন্ধকার হয়ে এল, যাই সন্দে-টা দেখিয়ে আসি।"

বাধা দিয়া বলিলাম, "থাক পিসী উঠো না, আলোটা আমিই জ্বেলে দিচ্ছি।"

"শুধু আলো জ্বালালেই ত হবে না বাবা, হিঁদুর ঘরে গেরস্থর মঙ্গলের জন্য সকাল-সন্দেয় ছড়াজল দেওয়া আছে, যে কটা দিন বাঁচি দিয়ে যাই এমনি করে।" এই বলিয়া সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। পথে আসিতে আসিতে বার বার আমার মনে হইতে লাগিল, ভালবাসাটাই সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নয়, তাহার সঙ্গে থাকা চাই এমনিতর গভীর কল্যাণবোধ। তাহা যেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে শুধু মনের একটা উচ্ছ্বাস, একটি দুর্দ্দমনীয় আবেগ মাত্র।

তাহার পর মাস চার পাঁচ কাটিয়া গিয়াছে। নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে এ কয়মাস আর বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে আসিয়া শুনিলাম, প্রায় মাসখানেক হইল গোষ্ঠ সস্ত্রীক দেশে আসিয়াছে।

অঘোর-পিসীর সহিত দেখা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলাম, "কি গো পিসী, বৌ কেমন ঘর-কন্না করছে ?"

এদিক ওদিক চাহিয়া ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "বাড়ীর বউ যদি অত বাবু হয়, তা হলে তাকে নিয়ে কি আর ঘর-কন্না করা চলে গা বাবা ? বৌমা আমার জলটি পর্য্যন্ত তুলে খেতে পারবে না, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। আমাদের গেরস্থর ঘরে কি আর ওসব চলে ?"

অঘোর-পিসী সংসারের আরও অনেক কথা বলিল। বুঝিলাম পুত্রবধূর সহিত তাহার আজও তেমন বনিবনাও হয় নাই।

সেদিন সকাল বেলায় বসিয়া বসিয়া সদ্যঃপ্রাপ্ত খবরের কাগজখানার পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় কাপড়ের একটা পুঁটুলী বগলে করিয়া অঘোর-পিসী আসিয়া বলিল "চললুম গো বাবা।"

বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা চললে গো পিসী ?"

"কাশীতে, সেখানে আমার এক বোনঝি-জামাই আছে কি না।"

শুনিয়াছিলাম বটে, কাশীতে তাহার ঐ রকম কে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে, কিন্তু হঠাৎ আজ অঘোর-পিসীকে পোঁটাল-পুঁটুলী লইয়া কাশী যাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া

থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ সেখানে যে বড় ?"

স্খলিত কণ্ঠে অঘোর-পিসী বলিল, "আর কি বাবা যাদের ঘর-কন্না তাদের হাতে সব বুঝিয়ে দিয়েছি, এবার আমার ছুটি।"

তাহার কথার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয়ই বাড়ীতে একটা কিছু হইয়াছে, তাই অঘোর-পিসী রাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতেছে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কার সঙ্গে যাচ্ছ পিসী ?"

"সঙ্গে কারও যাবার দরকার নেই, হাওড়ার ইষ্টিশনে গোষ্ঠ কাশীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে সেখানে বোনঝি-জামাইকে একখানা টেলিগেরাপ করে দেবেখন, সে ইষ্টিশনে এসে নামিয়ে নেবে।"

"আবার কবে আসবে পিসী ?"

"আসবার কথা আর বল না বাবা, তোমাদের পাঁচজনের কল্যাণে হাড় ক'খানা যেন বাবা বিশ্বনাথের চরণে রেখে আসতে পারি।"

সেইদিনই দুপুরের গাড়ীতে অঘোর-পিসী কাশীতে চলিয়া গেল।

দিন পনের পরের কথা। স্কুলের ছুটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঘরের রোয়াকে মাদুর পাতিয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতে পড়িতে মধ্যাহ্নের অলস-আমেজে একটুখানি তন্দ্রার

মত আসিয়াছিল। হঠাৎ যেন মনে হইল অঘোর-পিসী আমায় ডাকডাকি করিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে দেখি, সত্য সত্যই আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাঝের পাড়ার অঘোর-পিসী। তাহাকে হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিতের মত আমি তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। আঁচলের গেরোটা খুলিতে খুলিতে অঘোর-পিসী বলিল, "মা অন্নপূর্ণার পেসাদ, আসবার সময় মার পূজো দিয়ে এলুম কি না।"

তাহার হাত হইতে প্রাসাদের খুরিখানা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হঠাৎ যে ফিরে এলে পিসী।"

মুখ ফিরাইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া খাটো গলায় অঘোর-পিসী বলিল, "সেখানে বোনঝির মুখে শুনলুম কাশীর বীরেশ্বর ঠাকুর না কি খুব জাগ্রত দেবতা, তাঁর ফুল-কাড়ান মাদুলী ধারণ করে অনেক মেয়ের না কি ছেলেপুলে হয়েছে, তাই ভাবলুম দি নিয়ে গিয়ে বৌটাকে, বাবার দয়ায় যদি কিছু হয়।"

কাশীর কথা লইয়া কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করার পর অঘোর-পিসী সেইদিনকার মত উঠিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে অনেক দিনের পর পুনরায় আমি গল্প লিখিতে বসিলাম। এবার আমার গল্পের বিষয়বস্তু হইল আমার নিত্য দেখা অঘোর-পিসীর জীবন-নাট্যের একটি খণ্ডকাহিনী। গল্পের নাম দিলাম "কল্যাণী"।

নিরুদ্দেশ

যুগের পর যুগ অতীতে চলিয়া পড়িয়াছে কিন্তু আজও আমি সেই ছেলেটার কথা ভুলিতে পারি নাই। একটা অবোধ বাল্য-শিশুর দুঃখভরা জীবনের অনুক্ত ইতিহাস আজও আমার মনের মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া সময় সময় আমাকে চঞ্চল করিয়া তোলে, সংসারের সুখদুঃখের সকল চিন্তাকে বহু উর্দ্ধে অতিক্রম করিয়া যায়।

তাহার কথা স্মরণ হইলেই আমার নয়নপটে ভাসিয়া ওঠে আট দশ বৎসরের একটা শান্ত বালক, চোখ দুটীতে যেন স্বপ্নলোকের মায়াকাজল মাখান, বয়সের অনুপাতে হয়ত একটু ছেলেমানুষী ভরা। আমার এই সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনে মাত্র ঐ একটি ছাত্র আসিয়া ছিল, চলিয়া গিয়াছে—তাহার পর আর আসে নাই।

প্রথম তাহাকে দেখিলাম, একদিন নির্জ্জন নদীতীরে অশ্বত্থ-

ছায়ায় বসিয়া বালকটী সন্মুখে জলের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে জিজ্ঞাসা করিল "ঐখানকার ঐ জলটা অমন কোরে ঘুরচে কেন?" ঐখানকার ঐ জলটাকে আমিও রোজই ঘুরতে দেখি, কিন্তু—কেন যে ঘুরিতেছে সে তথ্য জানিবার প্রশ্ন কোনদিনই মনে উদয় হয় নাই। তাহার আগ্রহ-ভরা পিপাসার্ত্ত নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তর দিলাম, "ওর তলায় পাতালপুরী।" ছেলেটী হাসিয়া বলিল, "পাতালপুরী, হি হি হি, বেশ নামটা ত'?"

অবোধ শিশুর কচিমুখে বায়না-করা সেই হাসিটা সামঞ্জস্য-হীন কেমন অবাস্তব ঠেকে। জিজ্ঞাসা করিলাম "খোকা তোমাদের বাড়ী কোথায়, তোমার বাবার নাম কি?"

ছেলেটী উত্তর দিল "আমার বাবার নাম ৺অপূর্ব্বকুমার মুখোপাধ্যায়, আমাদের বাড়ী ত এখানে নয়। আমরা কাল সবে এসেছি।"

"এখানে কা'দের বাড়ী এসেছ খোকা?"

"চৌধুরীদের বাড়ী।"

চৌধুরীরা বড়লোক, কত লোক, কত ছেলে তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করে হয়ত তাহাদের কোন কুটুম্বের ছেলে হইবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "চৌধুরীদের বাড়ী তোমার মামার বাড়ী বুঝি?" খিল খিল করিয়া হাসিয়া ছেলেটী বলিল "দূর,

তা কেন হ'বে? চৌধুরীদের বাড়ী আমার মা রাঁধতে এসেছে।”

”তোমার নাম কি খোকা?”

“আমার নাম শ্রীশৈলপতি মুখোপাধ্যায়।”

“তোমাদের বুঝি আর কেউ নেই?”

“থাকবে না কেন? বাড়ীতে জেঠামশাই আছে, জেঠাইমা আছে, বড়দা, নণ্টু, মালতী, খোকা, সবাই আছে। আমার জেঠামশাই খুব গরীব, আমাদের খাওয়াতে পারবে না কিনা, তাইত আমার মা এদের বাড়ী কাজ কর্ত্তে এসেছে।”

চৌধুরীবাড়ীর রাঁধুনীর ছেলে শৈলর উপর আমার কেমন একটা মায়া পড়িয়া গেল।

তাহার পর প্রায়ই দেখিতাম শৈল হয়ত মাঠে একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে নয়ত বা নদীর ধারে পা ছড়াইয়া বসিয়া বইচি ফলের মালা গাঁথিতেছে। চোখাচোখি হইলে বলে “খোকা ভারি বইচি খেতে ভালবাসে।”

একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “শৈল তুমি পড় না কেন?” ঘাড় দুলাইয়া সে বলে, “হেঁ পড়িত', আমি শিশুশিক্ষা পড়ি, ফাষ্টবুকের ঘোড়ার পাতা শেষ হ'য়ে গেছে, ভারি মুস্কিল হয়—মা ইংরিজী ব'লে দিতে পারে না।” তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “শৈল, তুমি স্কুলে পড়বে? আমি তোমায় ভর্ত্তি কোরে

দেব'খন।" ইতস্ততঃ কোরে শৈল জবাব দেয়, "উঁ হুঁ তাহলে মার কাজ করবে কে? মা রোগা মানুষ একলা পারে না কিনা, তাই আমি মার অনেক ছোটখাটো কাজ ক'রে দিই।"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। শৈল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিল "মাষ্টার মশাই আপনি আমাকে ইংরিজীটা মাঝে মাঝে একটু বলে দেবেন।"

তাহার কপালের উপর বিক্ষিপ্ত চুলগুলিকে সরাইয়া দিতে দিতে বলিলাম "তুমি রোজ এসো শৈল, আমি তোমায় অনেক্ষণ ধোরে পড়াব।"

সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল "আচ্ছা মাষ্টার মশাই আমি এখন যাই, মাকে বলি গে। এই বলিয়া শৈল আত্মহারা হইয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেইদিন হইতে শৈল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে পড়িতে আসে, অনেক্ষণ অবধি পড়ে। এক একদিন আমারই কাছে খায়। আমি তাহাকে আলো ধরিয়া বাড়ীর কাছে রাখিয়া আসি।

একদিন তাহাকে বলিলাম "শৈল তুমি রোজ রাত্রে আমার কাছেই খেয়ে যেও।"

প্রথমটা শৈল রাজি হইল, কিন্তু দিন দুই পরে একদিন সে বলিল, "না মাষ্টার মশাই, মার পাতে না খেলে মার জন্যে ভারি মন কেমন করে।"

পাঠে রত শৈলর মুখের দিকে চাহিয়া সময় সময় ভাবি "কি অদ্ভুত এই শান্ত শিশুটী! পল্লীর সকল সরলতা পূর্ণ অনুপম দেব-শিশুর মত কি সুন্দর মুখশ্রী, দীপ্ত কালো চোখে সে কি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি, এই বয়সেই আত্মসংযমে কি সুকঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ।

আমার ছোট ভাই নাই, কোথা হইতে শৈল আসিয়া অনুজের মত আমার অন্তরের অনেকখানি আসন দখল করিয়া বসিয়াছে।

সেবার পূজার ছুটীতে দেশের বাড়ীতে যাওয়াই স্থির করিলাম। শৈলকে বলিলাম ছুটী ফুরাইবার পূর্ব্বেই আমি চলিয়া আসিব। শৈল আমার সহিত ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীতে বসিয়া কেবলই শৈলর কথা মনে হইতে লাগিল। আজ বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিলাম সে আমার হৃদয়টার কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

ছুটি ফুরাইবার দিন কয়েক পূর্ব্বে এখানে আসিয়াই শুনিলাম শৈলর মা মাত্র তিন দিনের জ্বরে শৈলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; শৈল এখন চৌধুরীদের বাড়ীতেই আছে। তৎক্ষণাৎ

তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, শৈলকে দেখিলে আর চেনা যায় না। পদ্মফুলের মত অমন সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। শরীর অসম্ভব রোগা দেখাইতেছে। শৈল আমার পায়ের ধূলো লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে সেই দিনই আমার এখানে চলিয়া আসিতে বলিলাম। শৈল বলিল "তা হয় নাতো মাষ্টার মশাই, চৌধুরীবাবুদের কাছে মার টাকা দশেকের দেনা আছে। ওরা আমায় বলেছে খেটে শোধ করে দিতে।"

মনটায় ভারি দুঃখ হইল—একটা অবোধ শিশুর উপর অন্যায় অত্যাচার ? জগতের বড়লোকগুলো এমনিই পাষাণ ! চোখের পরদা তুলিয়া তাহারা গরীবদের দেহের রক্ত এমনি করিয়াই শুষিয়া লয়।

শৈলকে বলিলাম "আমার মাইনে পেতে এখনও দিন পনের দেরী, মাইনে পেলে আমিই টাকাটা দিয়ে আসব'খন, তুই আজই চলে আয় শৈল।" নির্লিপ্ত কণ্ঠে শৈল জবাব দিল "ওরা তা আসতে দেবে না মাষ্টার মশাই।"

শৈলকে লইয়া চৌধুরীদের বাড়ী গেলাম। বড়বাবু বাহিরেই ছিলেন। তাঁহার কাছে শৈলর মার দেনা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিতেই বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "আপনি আমাদের সরকারের কাছে যান।" সরকার মশাইকে সকল কথা ব্যক্ত

করিয়া বলিলাম, "ছেলেটাকে পনের দিনের জন্য দয়া করে ছেড়ে দিন, পনের দিন পরে ও টাকা দিয়ে যাবে'খন আমি জামিন থাকছি।"

লাল শালু মোড়া পুরাতন রোকোড়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সরকার মশাই গম্ভীর ভাবে জানাইয়া দিলেন যে বড়বাবুর হুকুমের তিনি কিছুই করতে পারিবেন না।

রাগে গা গিস্ গিস্ করিতে লাগিল। শৈলকে বলিলাম "আচ্ছা তুই এই ক'টা দিন ওদের ওখানেই থাক, তারপর মাস-কাবারে ওদের টাকা ফেলে দিয়ে চলে আসিস।"

শৈল তাহাতেই রাজী।

ইহার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন শনিবার সকাল সকাল স্কুল হইতে আসিয়া দেখি শৈল আমার ঘরের সামনে তাহার পুঁটুলিটি লইয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া দেখিলাম তাহার মুখমণ্ডলে তিন চার জায়গায় ইতস্ততঃ ফুলিয়া কালসিটে পড়িয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কি হ'য়েছে রে?"

আমাকে দেখিয়া শৈল ড়ুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "বাবুদের বড়মার হার চুরি গেছে, তাই তারা আমায় সন্দেহ কোরে খুব মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলছি মাষ্টার মশাই আমি হারের কথা কিছুই জানি না।" এই বলিয়া শৈল জামা খুলিয়া তাহার পিঠ দেখাইল।

পিঠের জায়গায় জায়গায় ফুলিয়া রক্ত জমিয়া গিয়াছে। এক জায়গায় খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিয়া দগ দগ করিতেছে।

তাড়াতাড়ি তাহাকে ডাক্তারখানায় লইয়া গেলাম। ডাক্তার বাবু ঔষধ লাগাইয়া দিয়া বলিলেন "এর তাড়সে হয়ত একটু জ্বর হ'তে পারে, বিশেষ ভয়ের কারণ নেই।" তাহার পর একটু আসিয়া খাটো গলায় বলিলেন "আপনার এ সব হেঙ্গামা কেন? আপনি বিদেশী লোক চৌধুরীদের জানেন না, ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে হাত দিয়েছেন, শেষ কালে কি এই বাজারে চাকরীটা খোয়াবেন? স্কুলের সেক্রেটারী ওদের আপনার লোক মশাই।"

বিস্ময়ের সহিত বলিলাম "সে কি ডাক্তার বাবু? তা' এই ছেলেটাকে ওরা এমনি কোরে মেরে তাড়িয়ে দেবে আর আমরা সব ওকে না দেখে বড়লোকের অখণ্ড প্রতাপের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখব'? নাই বা রইল মশাই অমন চাকরী।"

আমতা আমতা করিয়া ডাক্তারবাবু বাললেন "না—তা বলছি না—হেঁ হেঁ এই যে, এই ওষুধটা দু'ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

পথে আসিতে আসিতে শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "হেঁ মাষ্টার

মশাই আমি আপনার এখানে এসেছি বলে আপনার এত ভাল চাকরীটা যাবে?"

তাহাকে বলিলাম "যাক্ চাকরী, তোর কোন ভাবনা নেই শৈল, তুই নিশ্চিন্ত থাক্।"

সন্ধ্যার পর হইতে শৈল ভাল করিয়া কথা বলিতেছিল না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বড্ড টাটিয়েছে শৈল?"

অন্যমনস্ক ভাবে শৈল জবাব দিল "না।"

রাত্রে শৈলর ঘুমন্ত মুখখানার পানে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম—অবোধ, অবোধ অসহায়, সংসার চেনে না, নেহাৎ ছেলে মানুষ। পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটিতে কেমন এক প্রকার মন কাড়িয়া লওয়া হাসি। যায়, যাক আমার এখনকার চাকুরী। শৈলর কাছ থেকে দিনে দিনে যে ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি তাহার মূল্যও নেহাৎ অল্প নয়।

এই সবের চিন্তায় বিভোর হইয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম খেয়াল নাই।

ভোরের বেলায় ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখি বিছানা খালি, শৈল নাই। মনে ভাবিলাম হয়ত বা সে বাহিরে কোথাও গিয়াছে, এখনি আসিবে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেও যখন সে আসিল না তখন আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। হঠাৎ দেখি আমার বাক্সের উপর

চসমার খাপ চাপা দেওয়া কি একটা কাগজ। তাড়াতাড়ি কাগজটা তুলিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিলাম শৈলর চিঠি।

শৈল চলিয়া গিয়াছে, ছোট্ট-কাগজ-খানিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সে চায়না যে তাহার জন্য আমার এমন চাকরীটা যায়, তাই সে এখান হইতে চলিয়া যাইতেছে।

জানলার গরাদেতে তাহার একটা ছেঁড়া গেঞ্জী ঝুলিতেছে। অন্যমনস্কভাবে সেটাকে লইয়া নাড়চাড়া করিতে লাগিলাম। গেঞ্জীটায় ছেলেমানুষের গায়ের মত কেমন একটা টোকো গন্ধ।

দিন কয়েক পরেই আমি সেখানকার স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া আসি। তাহার পর শৈলকে কত খুঁজিয়াছি, তাহার জেঠা-মশায়ের বাড়ীতে খবর লইয়াছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছি। কিন্তু কোথাও তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। হয়ত বা সে অনাহারে পথ চলিতে চলিতে কোন জনহীন মাঠের উপর পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নাই।

ভুলো না আমায়

ঠিক দশটায় তাহার এটেণ্ডেন্স। এক মিনিট দেরী হইলে এক ঘণ্টার মাইনে কাটা যায়।

পথে আসিতে আসিতে একটা গ্রামোফোনের দোকানে সুরেশ দেখিল দশটা বাজিতে আর মিনিট সাতেক বাকী আছে। এখনও অনেকটা যাইতে হইবে। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সে তাহার ভীত সঙ্কুচিত চরণযুগলকে টানিয়া লইয়া চলিল। ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া এফুট হইতে ওফুট যাইতেছে এমন সময় নারীকণ্ঠে কে তাহাকে হঠাৎ ডাকিল, "সুরেশ দা।"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া পাশে মুখ ফিরাইয়া দেখে ট্রাফিক পুলিশের আটক-করা সিমেণ্ট রঙের একখানা হিলম্যান গাড়ী, তাহার ভিতর হইতে একটী সহাস্যমুখী তরুণী বাহিরে মুখ রাখিয়া দীপ্ত ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নিকটে সরিয়া আসিলে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুরেশ দা চিনতে পারেন ?"

সুরেশের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "কে নীলা ?"

"তাহ'লে চিনতে পেরেছেন দেখছি !" এই বলিয়া নীলা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার শৈশব মুহূর্ত্তের অতি পরিচিত প্রিয় বান্ধবী পায়রা-গাছার সেই নীলিমা। ইহাদের বাড়ীতেই সুরেশের বাবা ছিল বাজার সরকার। বাজার সরকারের ছেলে বলিয়া কেহ তাহাকে বড় একটা গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু কোন এক পরম মুহূর্ত্তে এই আদরিণী বালিকাটীর চোখে সুরেশের চরিত্রের এমন একটী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্ত্তী বিরাট ব্যবধানটী ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। সে সব আজ প্রায় আট বছর আগেকার কথা। তখন নীলার বয়স ছিল বছর দশেক, আর সুরেশ ছিল তাহার চেয়ে বছর চারেকের বড়।

কিন্তু আজকের এই দেখা হওয়াটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই অভূতপূর্ব্ব।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সুরেশ ভাবিতেছিল, এই কি তাহার সেই বহুবিস্মৃত বাল্যজীবনের পুরাতন সাথী নীলা?

নীলা জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর, এমন হন্তদন্ত হয়ে চলেছেন কোথায়?"

এতক্ষণে সুরেশের অফিস যাওয়ার কথাটা স্মরণ হইল। বলিল, "আফিস যাচ্ছিলুম।"

গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া দিয়া নীলা বলিল, "আসুন আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসি। ভাগ্যিস্ পুলিশ গাড়ীটা দাঁড় করিয়েছিল।"

আবেগবিহ্বল সুরেশ ধীরে ধীরে মোটরে উঠিয়া তাহার পাশে উপবেশন করিল।

গ্রীবা বাঁকাইয়া নীলা বলিল, "উঃ, কতদিন পরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা, বাবা কোথায়, ভাল আছেন তিনি?"

ম্লান হাসিয়া সুরেশ জবাব দিল, "তিনি পৃথিবীর সকল ভাল মন্দর বাহিরে চলে গেছেন। তারপর তোমাদের সব খবর কি?"

"খবর সব একরকম ভালই, স্কটিশে ভর্ত্তি হ'য়েছি। আজ কলেজেরই একটা পার্টিতে যাচ্ছি।"

খুঁটিয়া খুঁটিয়া নীলা অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আছে, কাজকর্ম্ম কেমন হ'ল, বাবা কতদিন মারা গেলেন ইত্যাদি।

সুরেশ কিন্তু আকাশ পাতাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মত কিছুই খুঁজিয়া পায় না।

গাড়ী আসিয়া অফিসের দরজার নিকট উপস্থিত হইল।

স্বহস্তে গাড়ীর দরজটা খুলিয়া দিয়া নীলা বলিল "আমাদের ওখানে কবে যাচ্ছেন বলুন, আপনি গেলে মা বাবা খুব খুসি হ'বেন। তখন তখন আমরা আপনাদের কথা কত বলাবলি করতুম।"

অনর্থক একটুখানি হাসিয়া সুরেশ জবাব দিল, "যাব'খন একদিন।"

প্রতিবাদ করিয়া নীলা বলিল, "ওরকম 'যাব'খন একদিন' বল্লে চলবে না, কবে যাবেন তাই বলুন ?"

"আচ্ছা, সামনের রবিবারে বিকালে যাওয়া যাবে।"

"নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই ?"

কিন্তু যাব যাব করিয়াও নির্দ্দিষ্ট দিনে যাওয়া তাহার ঘটিয়া ওঠে না। মেড়োর অফিস, প্রত্যহ সকাল দশটা হইতে রাত আটটা পর্য্যন্ত ঘাড় গুঁজিয়া কাজ করিতে হয়। রবিবারেও ইহাদের ছুটীর নিয়ম নাই। তবে হাতে বেশী কাজ না থাকিলে সেদিন অপেক্ষাকৃত একটু পূর্ব্বে ছুটী হয়। এখানকার নিয়ম এই, ইচ্ছা হয় কাজ কর না হয় চলিয়া যাও! চলিয়া যাইবার সুবিধা নাই বলিয়াই যে এমন করিয়া পড়িয়া থাকে তাহা একবার তাহারা ভাবিয়া দেখে না।

রবিবার দিন বিকালবেলায় সে নীলাদের বাড়ী যাইবার জন্ত বাহির হইতেছে এমন সময় বিপুল ভুড়িটী নাড়িয়া শেঠজী বলিল, "একবার ঘুঘুড়ীতে যাওত বাবু, মাল গুদমে উঠেচে কিনা দেখে এস।"

ব্যাস্ ফিরতে যার নাম সেই রাত আটটা নটা। সম্মুখের প্রকাণ্ড বাড়ীটার গায়ে অপরাহ্নের মিলাইয়া যাওয়া রৌদ্রের

মত নীলাদের বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছাটা তাহার মনের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া গেল।

একদিন রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে পা পা করিয়া নীলাদের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সুরম্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ফটকের কাছে টুলে বসিয়া খোট্টা দরওয়ান হাতের চেটোয় খৈনী টিপিতে টিপিতে গুন গুন করিয়া রামের ভজন গাহিতেছে। তাহাকে সামনে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া টাঙ্গির মত পাকান গোঁপজোড়াটা নাড়া দিয়া দরওয়ানজী কহিল, "আরে কেয়া মাংতা হ্যায় বাবু, নোকরী হিঁয়া মিলেগা নেই। ফটক সে হট্ যাইয়ে।"

এইরূপ ধরণের প্রত্যাখ্যাত হওয়া তাহার জীবনে এই প্রথম। বেচারা কি আর করে। বাড়ীটার দিকে ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পিছু হাঁটিয়া চলিয়া আসে।

মাসখানেক পরে আবার একদিন পথে নীলার সঙ্গে দেখা। সেদিন বুধবার, দিনের আলোয় অফিস হইতে বাহির হইয়া ডালহৌসীর মোড়ে দাঁড়াইয়া লাইট-পোষ্টের গায়ে একটা বিজ্ঞাপন পড়িতেছে, এমন সময় একখানা গাড়ী আসিয়া তাহার সম্মুখে সশব্দে ব্রেক করিল। চাহিয়া দেখে গাড়ী হইতে নীলা স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে হাঁটিয়া আসিতেছে।

প্রশান্ত হাসিয়া সুরেশ বলিল, "আরে, নীলা যে, কোথায় গিয়েছিলে ?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া নীলা বলিল, "আচ্ছা লোক যা হোক। আজ আর ছাড়ছি না, চলুন যেতে হ'বে আজ আমাদের বাড়ী।"

নিজের আধময়লা কাপড়জামাটার দিকে একবার চাহিয়া সুরেশ যেন একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল।

নীলা বলিল, "ভাবছেন বুঝি কি বলে এড়িয়ে যাবেন ? উহুঁ, ওসব শুনছি না, আজ যেতেই হবে।"

রাস্তার লোকগুলো তাহাদের দিকে রীতিমত তাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। দাঁড়াইয়া থাকাটা আর ভাল দেখায় না দেখিয়া সুরেশ ধীরে ধীরে মোটরে গিয়া বসিল। পাশে বসিয়া নীলা বলিল, "খুবত গেলেন সেদিন ? আমি এই আসে এই আসে ক'রে ব'সেই রইলুম। মা বল্লেন 'সে কি আর আসবে রে, এতদিন তার কি আর আমাদের কথা মনে আছে' ?"

আনন্দে সুরেশের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। আড়ষ্ট গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিল, "গিয়েছিলুম একদিন, তোমাদের দরওয়ানটা নোকরী নেই মিলেগা বলে ভাগিয়ে দিলে।"

নীলা ছেলেমানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি যেমন বোকা, তাকে ত বলতে হয়।"

"কি বলব নীলা-দিদিমণিকে ডেকে দাও ?"

সলজ্জ হাসিয়া নীলা বলিল, "দূর তা কেন, একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিলেইত হোতো।"

"তাত হোতোই, কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা কিনা!"

নীলা হাসিয়া উঠিল। সুরেশও চেষ্টা করিতে লাগিল তাহার সঙ্গে একটুখানি হাসিতে। নীলার হাসিটা ভারি মিষ্টি।

সুরেশকে পাইয়া নীলার বাবা মা উভয়েই খুব খুসি। "এস বাবা এস" বলিয়া নীলার মা তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। নীলার বাবা মিঃ চাটার্জ্জি আত্মভোলা সদাশিব লোক। তাহাকে একবার বলেন "আপনি" একবার বলেন "তুমি"—কি যে বলিবেন ভাবিয়া পান না।

খানিক্ষণ গল্প করিয়া মিঃ চাটার্জ্জি উঠিয়া গেলেন।

সুরেশ নীলাকে বলিল, "আমিও এবার উঠি, রাত আট-টা হ'য়ে গেল।" নীলা বলিল "বা রে না খেয়েই পালাবেন বুঝি, সেটি হ'বে না, আসুন আপনাকে ততক্ষণ আমার আঁকা ছবি দেখাই।"

ছবির এল্‌বামখানা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ নীলা বলিল, "সুরেশ দা' ছেলেবেলায় আপনি খুব পদ্য লিখতেন না ? আপনার

লেখা একটা পদ্য এখনও আমার কাছে আছে, দেখবেন ?" এই বলিয়া নীলা একটা ফাইলের ভিতর হইতে কাটাকুটি করা একখানা লেখা কাগজ বাহির করিয়া আনিল।

হাসিয়া সুরেশ বলিল, "ওঃ, তুমি যে দেখছি ওটা এখনও রেখে দি'য়েছ।" কাগজখানার দিকে চাহিয়া নীলা বলিল, "পদ্যটা কিন্তু বেশ, মনে কোরেছিলুম নিজের নামে কোন একটা কাগজে ছাপিয়ে দেব। তা অতটা বিশ্বাসঘাতকতা করতে সাহস হোলো না।"

নীলার ঘাড়দুলুনিতে, হাসির সুকুমার ভাঙ্গিতে সুরেশ বাল্যের সেই চিরপরিচিত নীলাকে আবার যেন ফিরিয়া পায়।

নীলা জিজ্ঞাসা করে, "এখনও পদ্য লেখেন নাকি ?"

হাসিয়া সুরেশ জবাব দেয়, "নাঃ ওটা আর আমার ধাতে আসে না।"

এমন সময় নীলার মা আসিয়া বলিলেন, "তোর সুরেশদা'কে একটা গান শুনিয়ে দে না।"

সুরেশ নীলাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি গানও গাইতে পার না কি ?" হাসিয়া নীলা বলে, "একটু একটু ; শুনবেন একটা ?" এই বলিয়া অর্গ্যানের সম্মুখে বসিয়া নীলা চম্পক-অঙ্গুলিগুলির সাহায্যে চাবি টিপিয়া গায়—"আমি চঞ্চলহে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

গান থামিতে সুরেশ বলিল "বাঃ, চমৎকার।"

নির্দ্দিষ্ট চেয়ারটায় উপবেশন করিয়া নীলা বলিল, "আপনি ছেলেবেলায় সেই যে গাইতেন কি গানটা 'জানকী পাইবে পুনঃ হারাইবে কেঁদে কেঁদে হ'বে দিবা অবসান'—মনে আছে সে টা?"

ঘাড় নাড়িয়া সুরেশ বলিল, "না মনে নেই, তোমার যে দেখছি ছেলেবেলাকার সব কথাই মনে আছে?"

আঙ্গুল নাড়িয়া নীলা বলে,"স-ব কথা।"

তাহার গলায় দামী হারের লকেট-টা ঝকমক করিয়া দুলিয়া উঠিয়া সুন্দর মুখখানির সৌন্দর্য্য আরও অপার্থিব করিয়া তোলে।

সেইটার দিকে চাহিয়া সুরেশ বলিল, "বাঃ তোমার হারের লকেট্‌টা ত বেশ।" লকেট-টা হার হইতে খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে নীলা বলিল, "আপনার বিয়ে হ'লে বৌকে এটা উপহার দেব।"

হাসিতে হাসিতে সুরেশ লকেট-টা হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। মাঝখানে মিনের উপর সোনালী অক্ষরে বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া ছোট ছোট অক্ষরে লেখা, "ভুলো না আমায়।"

খাইবার সময় নীলার মা সম্মুখে বসিয়া "এটা খাও ওটা খাও" করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। আশৈশব মাতৃ-

হারা স্নেহের কাঙ্গাল সুরেশ সম্মুখে এই লক্ষ্মী-প্রতিমার মত পবিত্র আদর্শময়ী নারী-মূর্ত্তিটীর মধ্যে তাহার হারাইয়া যাওয়া দুঃখিনী মায়ের নিখুঁত ছবি আপন মনে কল্পনা করিয়া লইল।

যাইবার সময় নীলা ও তাহার মা তাহাকে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল। নীলা বলিল, "আবার কবে আস্‌ছেন ?"

নীলার মা বলিলেন, "এস বাবা আবার, কত বড়টী হ'য়েছ, তোমাদের সব দেখলে ভারি আনন্দ হয়।"

পদধূলি লইয়া সুরেশ বলিল "আসব বই কি।"

নীলার মা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ফটকের নিকট আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরওয়ানজী তাহাকে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিল।

সকালবেলা ছুটিয়া ছুটিয়া আফিস যাইবার সময় সে আজ ভাবিয়াছিল "এমন কোরে বেঁচে থেকে কি লাভ ?"

নীলাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ট্রামে বসিয়া এখন ভাবিতে লাগিল, "শুধু, বেঁচে থাকাটাই এ-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটী যেন অপূর্ব্ব রহস্যে ভরা।

তাহার পর মাসখানেক কাটিয়া গিয়াছে। যাই যাই করিয়া নীলাদের বাড়ী যাওয়া আর সুরেশের ঘটিয়া ওঠে না। জারুল কাঠের তক্তপোষের উপর শুইয়া ছটফট করিতে করিতে

কেবলই নীলার মুখখানা মনে পড়ে। জীবনে সে এক রোমান্সের সন্ধান পাইয়াছে। যে রোমান্স তাহাকে ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়া গতানুগতিক জীবনের পথে অশান্ত প্রাণের বেলায় পরম পরিতৃপ্তির সন্ধান আনিয়া দেয়।

এইরূপ অবস্থায় একদিন সকালে নীলাদের বাড়ীর দরওয়ান একখানা চিঠি লইয়া আসিল। নীলার মা লিখিয়াছেন সে যেন আজকালের মধ্যে অবশ্য অবশ্য করিয়া তাহাদের বাড়ীতে একবার আসে, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সুরেশ মরিয়া হইয়া ওঠে। অফিস কামাই করিয়া সে নীলাদের বাড়ী ছুটিয়া যায়।

নীলা বাড়ী নাই, কোন বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছে। এ-কথা সে-কথার পর নীলার মা বলিলেন, "আসৃছে পনরই নীলার বিয়ে, জামাইটী বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার, নাগপুরে থাকে।

নীলার বিয়ের কথায় সুরেশের মনে না সুখ না দুঃখ গোছের একটা অস্পষ্ট ভাব ফুটিয়া উঠিল। মুখে বলিল, "বাঃ, বেশত।"

নীলার মা বলিলেন, "তুমি বাবা পেটের ছেলের মতন, বোনের বিয়েতে তোমাকেও কিন্তু কোমর বাঁধতে হ'বে।"

সুরেশ জবাব দিল, "নিশ্চয়ই।"

দিন কয়েক পরের কথা। বিয়ের আর মাত্র পাঁচ দিন বাকী। একদিন রাত্রে সুরেশ নীলাদের বাড়ী গেল। নীলা

যতই তাহার নিকটে সরিয়া আসে সুরেশ ততই তাহাকে দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে। কোন কথা বার বার করিয়া প্রশ্ন করিলে তবে সে একবার তাহার উত্তর দেয়। আগের মত হাসিয়া নীলা জিজ্ঞাসা করে, "সুরেশ দা' তোমার হোল কি?"

সুরেশ বলে, "কি আবার হ'বে, কই কিছু না।"

বিয়ের পরদিন সকালে বর ক'নে বিদায়ের সময়, নীলা তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। সে যে কোথায় আত্ম-গোপন করিয়াছে কেহই তাহা বলিতে পারিল না। নীলার ঝালর-চাপা চোখদুইটি অশ্রুধারায় সজল হইয়া উঠিল। যাইবার সময় একটিবারও সুরেশদা'র সঙ্গে দেখা হইল না? নীলা একটী-বারও মনে স্থান দেয় নাই যে আজ শেষ বিদায়ের পরম মুহূর্ত্তে সে একেবারে ধরা-ছোঁয়া-নাগালের বাইরে চলিয়া যাইবে।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে মটোরে গিয়া বসিল।

নীলার বিয়ের, দিনপনের পরে একদিন সকালে ঘুমভাঙ্গা বিছানায় বসিয়া সুরেশ ভাবিতেছে, আবার তাহার জীবনের গতির সেই চিরপরিচিত পুরাতন ছন্দের কথা। সম্মুখের ঐ আকাশটার মত নীলা বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। সহজে ধরিবার মত কোন স্মারক-চিহ্নও তাহার কাছে রাখিয়া যায় নাই।

ঠিক এই সময়ে ডাক-পিয়ন তাহার নামে একটা পার্শেল

লইয়া আসিল। উপরে পড়িয়া দেখিয়া বুঝিল নীলা নাগপুর হইতে পাঠাইয়াছে।

দুরু দুরু বক্ষে পার্শেলটা খুলিয়া ভিতরের জিনিষটার দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

নীলার হারের সেই সুন্দর লকেটটা। মাঝখানে সোনালী অক্ষরে লেখা, "ভুলো না আমায়।"

-:*:-

সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলনে সমগ্র দেশে যুগ-পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দিকে দিকে সকল বর্ণের মহা-সম্মিলনের বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। দেব মন্দিরের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া যুবকগণ অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছে।

পায়রাগাছা গ্রামের যুবকগণ ঠিক করিল এবার তাহারা তাহাদের গ্রামে সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজা করিবে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, তেওর, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি সকল বর্ণের লোক এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আনন্দময়ী মাতার প্রসাদ পাইবে। সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া ছোট বড় সকলকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহারা ঘোষণা করিবে—তাহারা সবাই এক, পরস্পর পরস্পরের সহিত আত্মীয়তার সমসূত্রে গাঁথা।

হরি-সভার আটচালায় সভা করিয়া গ্রামের সকলকে ডাকিয়া এই কথাটা জানান হইল। সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে রাজী হইল। যুগধর্ম্মের কবলে প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণও এই সমস্ত অনুষ্ঠানে মত দিতে বাধ্য হন। যুবকগণ মহা উৎসাহে চাঁদার

খাতা হাতে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

গ্রামের সব-কয়জন অধিবাসীই প্রায় অব্রাহ্মণ। দু-পাঁচঘর যে কয়জন ব্রাহ্মণ আছে তাহাদের বংশপরম্পরায় চলিয়া আসা ঐ-নামটুকুই যা সম্বল। দেহের উপর সুবিন্যস্ত সাবান-ধৌত শুভ্র সুতা কয়গাছি ছাড়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবার আর কিছুই নাই। পূজা আহ্নিক করিবার তাহাদের অবসর কোথায়? চাকরী তাহাদের উপজীবিকা। সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া চা খাইতে খাইতেই বেলা হইয়া যায়। তাহার পর চট্‌পট্‌ স্নানাহারসারিয়া অফিস যাইতেই মাসের অর্দ্ধেক দিন তাহাদের দেরী হইয়া যায়—আবার পূজা আহ্নিক! তাহারা বলে পূর্ব্ব-পুরুষদের যুগে নাকি অন্নসমস্যা এতটা ছিল না। দুই বেলা দুই মুঠো আহারের জন্য দুর্ভাগ্যের সহিত প্রত্যহ আট ঘণ্টা ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে হইত না, তাই জপ, তপ, ধ্যান ছিল তাহাদের অবসর যাপনের একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান সময়ে ওগুলোকে আর বাদ না দিলে চলিবে না।

তাহারা এই সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে প্রাণ ঢালিয়া মত দিল যথাসময়ে সর্ব্বজনীন মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল। উন্নত, অনুন্নত সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ হরিসভার সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া মহানন্দে মায়ের প্রসাদ পাইয়া

চরিতার্থ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সকলেই আসিয়াছিল, আসে নাই শুধু গ্রামের দেবতা কালীমায়ের পূজারী ব্রাহ্মণ হরিদাস ঠাকুর।

ধর্ম্মভীরু সদাচারী ব্রাহ্মণ যুবা হরিদাস। গ্রামের উত্তর ধারে সনাতন মণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে গুটিকয়েক ছেলে লইয়া একটি পাঠশালা বসে! সেই ছোট্ট পাঠশালাটির গুরুমশাই হরিদাস। সংসারে সে আর তাহার স্ত্রী দুইটী প্রাণী। পাঠপালাটির আয়ে কোন রকমে তাহাদের সংসার চলিয়া যায়। কালীমায়ের আয়ও কিছু আছে, কিন্তু তাহা যৎসামান্য।

পাড়ার সমবয়স্ক যুবকেরা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া ডাকে "ভট্টচাই"। হরিদাস ঈষৎ হাসিয়া উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া থাকে।

সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার পর হইতে তাহার অবস্থাটা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিল। পাঠশালাটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পাড়ার কতকগুলি যুবক, যাহারা পাশ করিয়া ঘরে বসিয়া আছে, তাহারা হরিসভার অটচালায় একটী ফ্রী প্রাইমারী স্কুল খুলিয়াছে, কাজেই হরিদাসের পাঠশালাতে কেহ মাহিনা দিয়া আর ছেলে পাঠায় না। স্কুলের মাষ্টারেরা বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে' "কি গো মশাই ঠাকুর, তোমার পাঠশালায় ছেলে নেই কেন?"

একজন বলে, "আরে তুমিও যেমন, চাষীর ছেলেদের পড়ালে ঠাকুরের জাত যাবে যে।"

কিন্তু তবুও কালীরায়ের কৃপায় এই দুইটী প্রাণীকে অনাহারে থাকিতে হয় না। যেমন করিয়া হউক তাহাদের দিন এক রকম চলিয়া যায়।

কেহ কেহ বলে তাহারা নাকি বার দোয়ারীর হরেন ঘোষের বাড়ীতে বসিয়া হরিদাসকে তামাক খাইতে দেখিয়াছে। কেহ বলে "বেটা ভণ্ড", কেহ বলে "বকধাৰ্ম্মিক"। হরিদাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া তাহারা বলাবলি করে "ওঃ, ঠাকুরের চৈতনটা দেখেছ?...বলি ও ঠাকুর! শোন, শোন!"

থমকাইয়া দাঁড়াইয়া হরিদাস বলে, "কি?"

আঙ্গুল দিয়া দূরে দেখাইয়া দিয়া বলে, "দেখতে পাচ্ছ?"

সেদিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া হরিদাস বলে, "কই, কিছু নয় ত।"

"সে কি ঠাকুর দেখতে পেলে না? তোমার জন্যে যে স্বর্গের সিঁড়ী তৈরী হ'চ্ছে।"

হাসিয়া ফেলিয়া হরিদাস বলে, "সে কপাল কি আর কোরে এসেছি ভাই।" সে আর দাঁড়ায় না, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

তাহারা বলে, "উঃ, রাগে ভট্টচাযের চৈতন খাড়া হ'য়ে উঠেছে।"

গ্রামের ধারে রাস্তাটা যেখানে বাঁকিয়া খানাবাটীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই বাঁকের মাথায় বাদল ডোমের বাস। বাদল ছোট ছেলেদের জন্য ঢোলক তৈয়ারী করিয়া পেট চালায়; লোকের বাড়ীতে পূজাপার্ব্বণে ঢাক বাজাইয়াও মাঝে মাঝে কিছু পায়। একটা পেট এক রকমে চলিয়া যায়।

একদিন রবিবার সন্ধ্যায় হরিদাস গিয়াছিল কলাছড়ার মিত্তিরদের বাড়ী স্ত্রীর গলার হার বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিতে। সংসার তাহার অচল হইয়া পড়িয়াছে, পাঠশালাটি উঠিয়া যাইবার পর আর তাহার কোন কাজ এক রকম নাই বলিলেই চলে। ফিরিবার সময় বাদলের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতে আসিতে সে যেন অস্ফুট গোঙানীর শব্দ শুনিতে পাইল, যেন বাদলের ঘরের ভিতর হইতেই আসিতেছে। পা পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সে বাদলের উঠানের উপর দাঁড়াইয়া ডাকিল "বাদল?" ঘরের ভিতর হইতে কে যেন জড়াইয়া জড়াইয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কি উত্তর দিল, হরিদাস তাহা বুঝিতে পারিল না। দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া হরিদাস দেখিল ঘরে আলো নাই। হাতের লণ্ঠনটা উস্কাইয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখিল ঘরের কোণে মুড়িশুড়ি দিয়া পড়িয়া বাদল গোঙাইতেছে।

লণ্ঠনটা মুখের কাছে ধরিয়া হরিদাস ডাকিল, "বাদল!"

বাদল যেন অতি কষ্টে একবার চক্ষু উন্মীলন করিল। তাহার দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু দানা বাঁধিয়া উঠিয়া শীর্ণ গাল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। হরিদাস গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে বাদলের গা পুড়িয়া যাইতেছে, সে অচৈতন্যপ্রায় পড়িয়া আছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। কি করিবে হরিদাস ঠিক করিতে পারিল না। লণ্ঠনটা বাদলের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গ্রামের পাকা রাস্তার ধারে ডাক্তারখানা। তক্তপোষের উপর বসিয়া ডাক্তারবাবু একখানা বই পড়িতেছেন। দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া হরিদাস ডাকিল, "ডাক্তারবাবু?"

পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কে? ভটচায্, কি খবর হে?"

"আজ্ঞে, রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে দেখলুম বাদলের খুব জ্বর, এক্কেবারে বেহুঁসে পড়ে আছে। একবার চলুন না, আহা বেচারার কেউ নেই।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন বলি, "বাদল কে?"

"আজ্ঞে বাদল ডোম।"

ডাক্তারবাবু পুনরায় বইএর পাতায় মন সংযোগ করিয়া

কহিলেন, "ওর পয়সা দেবে কে? আমি ত আর ওষুধ দাতব্য করতে বসিনি; তা ছাড়া এই সেদিন সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় আমার অনেক টাকা খরচা হয়ে গেছে।"

সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজা উৎসবের এই ডাক্তার ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

হরিদাস চুপ করিয়া অল্পক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর টেঁক হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া ডাক্তার বাবুর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "এই নিন আপনার ফি, একবার দয়া কোরে চলুন ডাক্তারবাবু।"

টাকা দুইটা পকেটে ফেলিতে ফেলিতে ডাক্তারবাবু বলিলেন, "ওঃ, বাদলা তোমায় টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে।"

শক্ত রোগ, টাইফয়েড, দুই দিন ধরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও হরিদাস বাদলকে বাঁচাইতে পারিল না। তিন দিনের দিন সকাল বেলায় তাহার চোখের তারা দুইটি বার কতক ঘুরিয়া উপর দিকে উঠিয়া নিশ্চল হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ হরিদাস বাদল ডোমের পায়ের বুড়ো আঙুল ডান হাতে টিপিয়া ধরিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন।"

ডোমের মৃতদেহ পোড়াইবে কে? গ্রামের লোকেরা যুক্তি

দিল মুর্দ্দাফরাস ডাকিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে। তাহারা হরিজন সেবাশ্রমের তহবিল হইতে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল।

হরিদাস সবিনয়ে জানাইল তাহার অর্থের প্রয়োজন নাই। শেষ পর্য্যন্ত না হয় তাহার স্ত্রীর হাতের সোনার সরু নোয়া গাছটায় সে ব্যবস্থা হইবে। সে শুধু চায় দু'চার জন লোকের সাহায্য—যাহাতে সে এই মৃত দেহটার সৎকার করিয়া আসিতে পারে।

তাহারা বলে, "পাগল! ও ডোমের মড়া ছোঁবে কে?"

অবশেষে হরিদাসকে একাই সকল কাজ সমাধা করিতে হইল। কাঠ কুটা যোগাড় করিয়া সে নিজেই নদীর ধারে পাকুড়-গাছের তলার পুরাতন শ্মশানে চিতা সাজাইয়া আসিল। তাহার পর দুই বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে মৃতদেহটাকে কাঁধে ফেলিয়া নিজেই হরিবোল দিতে দিতে লইয়া গেল।

নদীর জলে চিতার চিহ্ন যতটা পারিল মুছিয়া দিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পরলোকগত বাদল ডোমের শ্মশান-বন্ধু সদ্য-স্নাত হরিদাস যখন বাড়ী ফিরিল তখন হরিসভায় সভা বসিয়াছে। পথের উপর তাহাকে দেখিতে পাইয়া হরিজন আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা সেই ডাক্তারবাবুটি জানাইয়া দিলেন গ্রামের দেবতা কালীরায় ঠাকুরের পূজা তাহার দ্বারা আর চলিবে না, ডোমের মড়া ছুঁইয়া সে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

—*—

সাঁওতালী

বিস্মৃত যৌবন দিনের এক অনাবশ্যক কাহিনী।

তখন আমি বরাকরের কাছে একটা কলিয়ারীতে নূতন চাকরী করিতে গিয়াছি। গুটী কয়েক মহুয়া গাছের তলায় লাল টালীতে ছাওয়া আমার ছোট্ট কোয়ার্টারটি। সম্মুখে ধূ ধূ করিতেছে বহু-বিস্তৃত দূরবিসর্পী প্রান্তর। আশে পাশে কোম্পানীর আরও কতকগুলি ছোট ছোট কোয়ার্টার।

প্রত্যহ ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিয়া বারান্দার কোণে বেতের মোড়াটা পাতিয়া বসি। সম্মুখের পথ বহিয়া সাঁওতালী কুলি কামিনের দল পরস্পরের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া সমবেত কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে যে যাহার কাজে যায়। তাহাদের দিকে চাহিয়া মনে হয় ইহারা যেন জগৎকে জয় করিয়াছে। দুঃখ ও দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াই ইহারা হাসে, গান গায়, আত্মীয় স্বজন লইয়া আনন্দ করে। আমাদের মত হতভাগ্য কেরাণীগুলোর চেয়ে ইহাদের প্রাণের প্রাচুর্য্য ঢের বেশী।

প্রায় প্রত্যহই দেখি, দলের পিছনে সর্ব্বশেষে যায় একটী

সাঁওতালী যুবক আর একটী সাঁওতালী কিশোরী। যুবকটীর নাম বন্‌শী, আমাদেরই কলিয়ারীতে সে কুলীর কাজ করে। প্রত্যহ দুটী বেলা তাহার সহিত আমার চোখাচোখী হয়, আর মেয়েটী স্থানীয় এক কলিয়ারী ম্যানেজারের মেম সাহেবের নিকট আয়ার কাজ করে। তাহাদের সম্বন্ধে এইটুকু জানিতে পারিয়াছি। একদিন দেখিলাম বন্‌শী আর তাহার বান্ধবী দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। মেয়েটী বনশীর মুখের দিকে চাহিয়া অবোধ্য ভাষায় কি একটা কথা বলিল। উত্তরে বন্‌শী তাহার চুলের খোঁপা ধরিয়া মাথাটী ঈষৎ নাড়িয়া দিল। মেয়েটীও তাহার সুগোল সুডোল বাহুখানি উত্তোলন করিয়া ফস্ করিয়া বনশীর গালে একটা ঠোনা মারিয়া বসিল। হঠাৎ তাহাদের চোখ পড়িল আমার দিকে। আমাকে তাহাদের দিকে অসভ্যের মত চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বনশী বলিল "দেখ্‌ছিস বাবু, আমাকে টুরণী কেমনি কোরে মারলেক, আমি কিন্তু ছাড়বেক্ নি।"

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "টুরণী তোর কে হয় রে?"

"কে আবার হ'বেক রে, উ আমার কেউ হয় না।" এই বলিয়া বনশী টুরণীর হাত ধরিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

সেই হইতে প্রতিদিন কাজে যাইবার সময় তাহারা আমার সহিত দুটো একটা কথা না কহিয়া যাইত না। ..

একদিন কথায় কথায় টুরণী জিজ্ঞাসা করিল "বাবু তুহার বহু কুথাকে রে ?" তাহাকে রহস্য করিয়া বলিলাম "ঘরকে"।

টুরণী আমার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই কোয়ার্টারের ভিতরে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "ভিতরকে নাই ত, সে গেল কুথাকে রে।" হাসিয়া বলিলাম "পালিয়ে গেছে।"

এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিল যে আমি তাহাকে রহস্য করিতেছি।

সে হাসিয়া ফেলিল, "তবে আর কি হ'বেক রে ? তুহার বহু থাকলে তার সাথকে দুটো গল্প করে যেতাম"।

"কেন আমার সঙ্গে গল্প কর্ না।" স্বলাস্য হাসিয়া টুরণী বলিল "দুর তুহার সাথকে কি গল্প করবক রে।" এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। দিন কয়েক পরের কথা। সেদিন দেখি বনশী সকলের শেষে একা একা কাজে যাইতেছে। মুখখানি শুষ্ক, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, হাব ভাবে কেমন একটা নীরব নির্লিপ্ততা। তাহাকে টুরণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মলিন মুখে বনশী বলিল "কাল বিকাল থেকে তার বড় জোর বুখার হ'য়েছেক রে বাবু।"

দাওয়াই দিয়েছিস ?"

"দাওয়াই খাওয়াবার পইসা কুথাকে পাব বাবু ?"

"কেন সরকারী ডাক্তার রয়েছে ত"

"উ ডাক্তারটা বড় বজ্জাত আছেক রে, পইসা না দিলে দাওয়াই দিবেকনি।"

সরকারী ডাক্তার, ভদ্রলোকেদের কাছে ঔষধের জন্য পয়সার দাবী করিতে পারে না, তাহাতে চাকরীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মুর্খ ও দরিদ্র সাঁওতাল—আপীল করিবার মত বুদ্ধি বিবেচনা ইহাদের নাই, চোখ রাঙাইয়া ইহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু আদায় করিতে পারা যায় তাহাই হয় ডাক্তার বাবুর 'আউট ইনকাম'—অর্থাৎ উপরি, আর দু পয়সা উপরির আশাতেই ত এই অসভ্য কয়লা কুঠোর দেশে আসিয়া কাদায় গুন ফেলিয়া পড়িয়া থাকা।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুই কোথায় যাচ্ছিস্ ?"

"কাজ্‌কে।"

"এখানে টুরণীর কে আছে ?"

"কেউ নেই রে বাবু, ভিন্‌ গেরাম থিনে এসেছিল এখানে কাজকে।"

"তুই আজ আর কাজে যাস্‌নি, টুরণীকে দেখ্‌গে যা।"

"কাজ কে না গেলে খাইব কি বাবু, এক রোজ না খাটলে

উপুস যেতে হবে আমাদেরকে।"

অবসর সময়ে আমি নিজে হোমিওপ্যাথিক চর্চ্চা করিতাম। একটু দাঁড়াইতে বলিয়া ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেলাম। আমার ঔষধের বাক্সটা লইয়া আসিয়া বলিলাম "চল বনশী টুরণীকে দেখে আসি, আমিও ডাক্তারি জানি।" আনাড়ীর মত বনশী কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল "তোকে কত দিতে হ'বেক রে বাবু?"

তাহাকে যখন জানাইলাম যে আমায় কিছু দিতে হইবে না তখন তাহার চক্ষু দুইটী একবার ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। ঔষধের বাক্সটা তাহার হাতে দিয়া বলিলাম "চল্, আজ আর তোর কাজে যেতে হ'বে না।"

কোন কথা না বলিয়া বনশী আমাকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। শীর্ণ সিঙ্গারন নদীর ধারে ছোট ছোট খুপরীর মত সাঁওতালদের কতকগুলি ধাওড়া। তাহারই একটীর ভেজান আগড় ঠেলিয়া বনশী ভিতরে প্রবেশ করিল। পিছনে পিছনে আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

আলো বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট একখানা খুপ্‌রী। মেজের উপর একখানা থলে বিছাইয়া টুরণী অঘোরে পড়িয়া

আছে। মাথার শিয়রে একটা জলের কলসী ও জল খাবার একটা চটা ওঠা গ্লাস।

তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম "টুরণী?"

"একটু জল।"

কলসী হইতে জল গড়াইয়া বনশী একটু একটু করিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম সাদাসিধে জ্বর, শুধু উত্তাপটা একটু বেশী। জলের গ্লাসটায় কয়েক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিলাম। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে টুরণী আমার মুখের পানে নির্ণিমেষে চাহিয়া রহিল। বনশীর হাতে একটা টাকা দিয়া বলিলাল "যা, বাজার থেকে দুধ, সাবু আর মিছরি কিনে নিয়ে আয়; ভাত খেতে দিস্‌নে যেন আজ।" টাকাটা লইয়া বনশী বলিল "ইহার থেকে কত নিবক রে বাবু?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম "সব নিবি, যা নিয়ে আয় চট্‌ কোরে—আর দেখ্‌ বিকাল বেলা আমাকে গিয়ে বলে আসবি কেমন থাকে।" বনশী কোন কথা বলিল না। তাহার মুখের অবাক্‌ ভাষা দৃষ্টির অনির্ব্বচনীয়তার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সে একবার আমার মুখের পানে আর একবার হাতের টাকাটার দিকে সস্নেহে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একেবারে একটা টাকা খরচ করিবার স্বাধীনতা হয়ত তাহার জীবনে খুব কমই আসিয়াছে। বিকাল বেলা গিয়া দেখি টুরণীর জ্বর বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। অঘোর-অচৈতন্য অবস্থায় সে অনর্গল প্রলাপ বকিয়া যাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম তাহার চিকিৎসা করা আর আমার সাধ্যে কুলাইবে না। বনশীকে বলিলাম সরকারী ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতে, পয়সা আমি দিব। বনশী দ্রুতপদে ডাক্তারবাবুর ডিসপেন্সারী অভিমুখে চলিয়া গেল! ডাক্তারবাবু আসিলে তাহার হাবভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি আমাকে টুরণীর মাথার শিয়রে বসিয়া তাহাকে হাওয়া করিতে দেখিবার প্রত্যাশা করেন নাই। হাসিয়া তাঁহাকে বলিলাম "অবাক হ'বেন না ডাক্তারবাবু, ঘটনাচক্রে এখানে এসে পড়েছি।" ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া একটুখানি হাসিলেন। দিন আষ্টেক দশ পরে টুরণী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল। সেদিন রবিবার কাজকর্ম্মের বিশেষ কোন তাড়া নাই। সকাল বেলায় ঘরের রোয়াকে বসিয়া সেই সপ্তাহের একখানি সাপ্তাহিক লইয়া অন্য-মনস্ক ভাবে পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিলাম। গল্প কবিতা ও নানারকমের চিত্রবর্ত্তিকায় সাপ্তাহিকী খানি এক সম্ভারে সমৃদ্ধ। একটা গল্প পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মনে হইল টুরণী ও বনশীকে লইয়া যদি এমনিতর একটা গল্প সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে

কেমন হয় ?

চক্ষু বুঝিয়া ভাবিতেছিলাম, ঠিক এই সময়ে কাণের কাছে প্রতিধ্বনিত হইল "বাবু"। চাহিয়া দেখি বনশী, তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া টুরণী। ক'দিন জ্বর ভুগিবার পর তাহার সেই সুগোল সুডোল মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই বনশী বলিল "এখানকে তো তুর অনেক জানা শুনা লোক আছেক্ বটে, তাদের ঘরকে টুরণীর একটা কাজ ক'রে দে বাবু।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন টুরণী ত চাকরী করছিল, সে চাকরীর কি হ'লো ?"

"উরা আর লিবেক না, দশ রোজ নাগা হয়েছেক্ বটে।"

দশ রোজ নাগা হইয়াছে বলিয়া টুরণীর চাকরী গিয়াছে। যাহারা দরিদ্র দিনমজুর তাহাদের চলিতে হইবে ঠিক মেসিনের মত। চলিতে চলিতে থামিলেই বিপদ, অকেজো বলিয়া বাতিল হইয়া যাইবে। বলিলাম, "তা আমি চাকরী কোথায় পাব ?"

"একটা দেখে দিতেই হবেক বাবু নইলে টুরণী না খেতে পেয়ে মরে যাবেক রে।" সবইত বুঝিলাম কিন্তু টুরণীর জন্য এখন চাকরী কোথায় খুঁজি। এখানে নূতন আসিয়াছি, যাহাদের চিনি তাহাদের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যতা নাই, কাজেই কি

উপায়ে কোথায় যে টুরণীর চাকরী করিয়া দিতে পারি তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। একটুখানি ভাবিয়া টুরণীকে বলিলাম "কেন তুই ত খাদে কাজ করতে পারিস ?"

টুরণী বলিল "খাদের লোকেরা ভারি বজ্জাত।"

"আমিও ত খাদের লোক।"

"তুই বাবু ভাল নোক আছিস।"

"আমার ঘরে কাজ করবি ?"

"কেন করব না রে, তুই ত আপনা হাতে ভাত রাঁধিস।"

আমি কুকারে রান্না করিয়া খাই, তাহার মধ্যে চাকরের বড় একটা প্রয়োজন বোধ করি না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "সত্যি তুই থাকৃবি টুরণী ?"

টুরণী বলিল "কেন থাকব নারে, তুই যে আমার জান বাঁচিয়েছিস রে।" সেই হইতে টুরণী আমার বাসাতেই থাকিয়া গেল। আমি তাহাকে সকল কাজ কর্ম্ম দেখাইয়া দিলাম। জল তোলা, কাপড় কাচা, কুটনো কোটা ইত্যাদি বাহিরের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম সেই করিতে লাগিল। খোরাকীর দরুণ সে আমার বাসা হইতে রোজ চাল লইয়া যায়, মাহিনা বলিয়া আমি তাহাকে মাসে মাসে দুটাকা করিয়া দিই। সে তাহাতেই খুব খুসী।

দিন কয়েক পরে একদিন সকাল বেলায় দেখি টুরণী কাজ করিতেছে বটে কিন্তু আজ কাজ কর্ম্মে তাহার যেন উৎসাহ নাই, হাবভাবে কেমন একটা নীরব নির্লিপ্ততা, মুখখানি একটু মলিন—যেন অশ্রুবিধৌত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হ'য়েছে রে টুরণী ?"

টুরণী কোন কথা বলিল না, সে মুখ বুজিয়া কুটনো কুটিতে লাগিল। তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিলাম "এই বল্‌না তোর কি হ'য়েছে ?" টুরণী যাহা বলিল তাহার ভাবার্থ এই—মাস ছয়েক পূর্ব্বে বনশীর সহিত যখন তাহার প্রথম ভাব হয় তখন বনশী একদিন তাহার গা ছুঁইয়া শপথ করিয়াছিল সে কখনও আর তাড়ী খাইবে না ; কিন্তু কাল রাত্রে কতকগুলি দুষ্ট সঙ্গীর পাল্লায় পড়িয়া আবার সে তাড়ী খাইয়াছে। তাহাকে বলিলাম "খেলেইবা, তোর তাতে কি ?"

আমার কথার উত্তরে সে বলিল বলিল "মুখপোড়া আমার গায়ে হাত দিয়ে কিরা কোরলেক্ কেন্ ? মিথ্যেবাদী নিমক-হারাম কুথাকার।" টুরণীর সেই অশ্রুবিধৌত মুখখানির পানে তাকাইয়া হঠাৎ মনে হইল এই দুইটী সাঁওতাল নরনারীর মধ্যে একটী ধর্ম্মের সম্পর্ক পাতাইয়া ইহাদের দুইটী হৃদয়কে একটী সহজ আত্মীয়তার সমসূত্রে গাঁথিয়া দিলে কেমন হয় ? তাহাকে বলিলাম "আচ্ছা টুরণী, বনশীর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় ?"

"দূর" বলিয়া ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া টুরণী কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে দেখি টুরণী প্রতি দিনের মত বনশীর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া হাসিয়া গল্প করিতে করিতে কাজে আসিতেছে। আমার বাসার কাছাকাছি আনিয়া বনশী তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা চলিয়া গেল। টুরণী নিকটে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে তোদের আবার ভাব হ'য়ে গেছে?" প্রসন্ন হাসিয়া টুরণী বলিল "ঐ মিথ্যেবাদীটা বাবু আবার আমার গা ছুঁয়ে কাল কিরা কর্‌ছেক্।"

তাহার কথায় ও হাসিবার ভঙ্গিতে আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না সকল প্রকার প্রেমের প্রথমেই থাকে এমনিতর একটা প্রাণ, সচেতন অভিনয়—যাহা মানব অন্তরের ভাবপ্রবণতা এক নূতন সচেতনায়, নূতন সমীপতায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলে।

টুরণী হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল "বাবু তুই সাদি করবি কবে রে, বুখার হ'লে কে দেখবেক্ তুরে!" হাসিয়া বলিলাম "কেন তুই।"

সে নত মুখে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে পায়ের আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। তাহার আরও নিকটে সরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম "কিরে দেখ্‌বি না তুই ?" মুখখানি তুলিয়া আমার উপর পরিপূর্ণ একটী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল "কেন্‌ দেখ্‌ব না রে বাবু, এক সময় তুই আমার জান্‌ বাঁচিয়েছিস্‌, আমিও তুর তরে জান কবুল করতে রাজী আছিবাবু!"

কবে তাহার অসুখের সময় সামান্য কিছু অর্থ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলাম, তাহার পরিবর্ত্তে সে আজ আমার জন্য জান পর্য্যন্ত কবুল করিতে প্রস্তুত। অশিক্ষিত দরিদ্র সাঁওতাল, লোকের চোখে তাহারা অসভ্য ও অসামাজিক কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা অকৃতজ্ঞ নয়। টুরণীর উপর অকারণে আমার কেমন একটা মমত্ববোধের সৃষ্টি হইল। টুরণীকে বলিলাম "বনশীকে তুই সাদি কর্‌, খরচ পত্তর যা হয় আমি দেব।" হাসিয়া টুরণী বলিল "তুই এখনও ছেলে মানুষ আছিস কিনা, তাই রাত দিন কেবল সাদি সাদি করিস।"

"আর তুই বড্ড বুড়ী হয়ে গেছিস্‌, নয়রে টুরণী ?"

গ্রীবা বাঁকাইয়া টুরণী বলিল "যাঃ, খালি সাদি সাদি করলেক আমি আর কাজকে আসবুনি।"

"কাজকে না এলে গিল্‌বি কি ?"

"কেন খাদকে যাব, মাল কাটব।"

"তাই যাস্‌"—এই বলিয়া আমি নিজের কাজে চলিয়া গেলাম

টুরণী কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত আমার আজ্ঞা পালন করিল না। পরদিন প্রত্যুষে আমার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই সে আসিয়া তাহার নিত্যকারের কাজে লাগিয়া গেল। এমনি করিতে করিতেই একদিন সে হঠাৎ আমার অন্তরের অনেকখানি নির্ব্বিঘ্নে দখল করিয়া বসিল।

সেদিন বিকাল বেলায় অফিসের কাজ কর্ম্ম সারিয়া ফিরিবার পথে একটী সাঁওতাল দম্পতিকে তাহাদের ধাওড়ার বাহিরে বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া আমার মানস-চক্ষে টুরণী ও বনশীর ছবি পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিল, তাহাদের দুজনার পরিচয়সূত্রে একটী গ্রন্থি গাঁথিয়া দিয়া বাসা বাঁধাইবার সেই পুরাতন প্রবৃত্তি আবার আমার অন্তরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বাসায় ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ বনশীকে ডাকাইয়া আনিলাম। তাহাকে টুরণীকে বিবাহ করিবার কথা বলাতে সে লজ্জায় অধোবদনে রহিল।

টুরণীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কিরে তুই কি বলিস্ ?" নামার কথায় টুরণী ম্লান একটুখানি হাসিল, তাহার পর বলিল "আমি আর কি বলব বাবু, উ আমায় সাদি করবেক নি।

অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাব "কেন করবেক নি ?

টুরণী বলিল "আমি কাহারের মেয়ে আর উ আমার থেকে

জাতকে উচু আছে।” তাহার কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া আনাড়ীর মত আমি একবার তাহার মুখের পানে আর একবার বনশীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম।

বনশী বলিল “আমরা জানি বাবু, তুই আমাদের মধ্যে সাদি করিয়ে দিতে চাস্ কিন্তু সে কেমন কোরে হবেক বাবু, তা হ'লে যে আমাদেরকে কেউ জাতকে নেবে নি।” ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। সাঁওতালদেরও জ্যাত আছে ধর্ম্ম আছে, আবার আমাদেরই মত সমাজ আছে। জাতি ধর্ম্ম সমাজের সেই কঠোর অনুশাসনলিপির চাপে তাহাদের হৃদয়ের ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কতকটা আপন মনে টুরণী বলিয়া যাইতে লাগিল ভিন্ গাঁয়ের একটা কামিনের সহিত বনশীর বিবাহের সব ঠিক-ঠাক্ হইয়া গিয়াছে। টাকার জোগাড় করিতে পারিতেছে না বলিয়া বিবাহ হইতেছে না। তিনমাস আমার এখানে চাকুরী করিয়া টুরণী তাহার মাহিনার ছয়টী টাকাই জমাইয়াছে আর চার টাকা হইলেই বনশীর বিবাহের সকল খরচ পত্র কুলাইয়া যায়।

বলিতে বলিতে টুরণীর সেই সুচারু চক্ষু দুইটী অশ্রুসজল ধারায় চক চক করিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া ঘর হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া আনিয়া টুরণীর হাতে দিয়া

বলিলাম "এই নে, মাইনের টাকা তুই নিজে খরচ করিস, তা থেকে আর তোকে দিতে হ'বে না।" সে কোন কথা বলিল না। নোট খানা লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপন মনে অনাবশ্যক কতকগুলি ভাজ করিয়া আলগোছে বনশীর হাতে ফেলিয়া দিল।

বনশী চলিয়া গেলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তারপর তোর কি হ'বে?"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে টুরণী জবাব দিল "কি আবার হ'বেক?"

"তুই একা থাক্‌বি কি কোরে?"

"যেমনটী কোরে তু থাকিস।" এই বলিয়া সে কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেল।

দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন আমার বদলির নোটীশ আসিল—কলিকাতার হেড্ অফিসে গিয়া কাজ করিতে হইবে।

সকল কথা শুনিয়া টুরণী বলিল "তুই দেশকে গিয়ে একটা সাদি করিস্ বাবু, তুরা পুরুষ মানুষ সাদি না হ'লে——!" তাহার অসমাপ্ত কথাটা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া বলিলাম "ঘর চলে না, নয়রে টুরণী?" সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আসিবার দিন তাহার হাতে কিছু টাকা দিতে গেলাম। সে কিছুতেই লইবে না। আমি জোর করিয়া তাহার আঁচলে

-বাঁধিয়া দিলাম। আমি চলিয়া আসিলাম। পথের ধারে একটা মহুয়া গাছের গায়ে ঠেসান দিয়া টুরণী চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চলিতে চলিতে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখি সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতেছে।

তাহার পর টুরণীর সহিত আর আমার কখনও দেখা হয় নাই। মাস পাঁচ ছয় পরে আমাকে কর্ম্মোপলক্ষে আর একবার সেখানে যাইতে হইয়াছিল। গিয়া দেখি স্ত্রীকে লইয়া বনশী দিব্যি সংসার পাতিয়াছে। তাহার নিকটে টুরণীর খোঁজ করিতে জানিতে পারিলাম মাস তিন চার আগে টুরণী এক চা বাগানে কাজ করিতে গিয়াছিল, তাহার আর কোন উদ্দেশ নাই। কে জানে, বনশী আর কখনও তাহার কোন উদ্দেশ পাইবে কিনা।

স্নেহ

মাত্র আড়াই বিঘা ধানের জমি, তাহাতে কোন রকমে সারা বছরের মোটা ভাতটা হইলেও সংসারের অন্যান্য খরচের জন্য পাঁচকড়িকে প্রতিবছর একবার করিয়া বিদেশে যাইতে হয়। পৌষমাসের মাঝামাঝি মাঠের ধান কাটা সারা হইলে পাঁচকড়ি খড়গুলি সব বিক্রী করিয়া দিয়া কলিকাতায় আসে। কলিকাতা তাহাদের গ্রাম হইতে বেশী দূর নয়, ট্রেনে করিয়া গেলে মাত্র ঘণ্টা চারেক লাগে। তাহার পর বর্ষা নামিলে আবার সে দেশে ফিরিয়া যায়। এই কটা মাস পাঁচকড়িকে দেখা যায়, সে মাথায় একটা টিনের বাক্স চাপাইয়া কলিকাতার পথে পথে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে "চাই চুড়ি, ভাল বেলওয়ারী চুড়ি।"

মুর্গীহাটা হইতে সস্তায় পাইকারী হিসাবে চুড়ি কিনিয়া সেগুলি সে পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে ফেরি করিয়া বেড়ায়। আজ পঁচিশ বছর ধরিয়া পাঁচকড়ি এই কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই তাহাকে চেনে। পঁচিশ বছর আগে যে সব মেয়েরা একদিন সাগ্রহে তাহার কাছে

চুড়ি পরিয়াছিল আজ তাহারা সব গৃহিনী হইয়া গিয়াছে। পাঁচ-কড়িকে দেখিয়া এখন কেহ বা তাহাদের ঘোনটা টানিয়া দূরে সরিয়া যায়, কেহ বা ধড়াস করিয়া তাহার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়। কালের গতি এইরূপ।

তখন বৈশাখ মাস। রৌদ্রের তাপে পথ ঘাট সব তাতিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুপুর বেলায় পাঁচকড়ি মাথায় বাক্স চাপাইয়া "চাই, চুড়ি চাই" করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বড় রাস্তাটা পার হইয়া সরু একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলে পিছন হইতে হঠাৎ কে তাহাকে ডাকিল "ও চুড়িওলা।"

খরিদ্দারের আহ্বানে পাঁচকড়ি পিছনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইল, দেখিল কেহ কোথাও নাই। শুধু দূরে পথের উপর গুটি কয়েক ছোট ছেলে মাটিতে ঘর কাটিয়া মহানন্দে লাট্টু ঘুরাইতেছে। আশপাশের বাড়ীগুলির দিকে সে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিল, রৌদ্রের তাপ আটকাইবার জন্য বাড়ীর নীচেকার দরজা জানালাগুলি সব ভিতর হইতে বন্ধ। কোথা হইতে কে ডাকিল তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া পাঁচকড়ি এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে আবার পথ চলিতে সুরু করিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক আসিল "ও চুড়িওলা, এই যে এদিকে,

ওপরে।” পিছন ফিরিয়া পাঁচকড়ি উপরের দিকে চাহিয়া দেখে পাশের বাড়ীর দোতলার বারান্দার ধারে রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বছর দশ এগারোর একটি মেয়ে। মেয়েটীকে দেখিয়াই পাঁচকড়ির বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁত্ করিয়া উঠিল। দেখিতে অনেকটা ঠিক তাহার নিজের মেয়ে মাধবীর মত। সেই রকম মুখচোখ, মাথায় একমাথা সেই রকম কালো কালো কোঁকড়ানো চুল, চাহিয়া থাকিবার ভঙ্গিটাও অনেকটা ঠিক সেই রকম। পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল “চুড়ি পরবে খুকী?”

মেয়েটী বলিল “না···তোমার কাছে পুঁতির মালা আছে?

ঘাড় নাড়িয়া পাঁচকড়ি জানাইল যে, না, সে পুঁতির মালা বিক্রী করে না।

উত্তর শুনিয়া মেয়েটী যেন মনে মনে একটু নিরাশ হইল, বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল “নেই?”

ঘাড় নাড়িয়া পাঁচকড়ি বলিল “না।” পরক্ষণেই কি ভাবিয়া আমার বলিল “আচ্ছা কাল এনে দেব ’খন।”

“কাল কি হবে, আজ যে আমার পুতুলের বিয়ে।”

“ও তাই নাকি···আচ্ছা···তবে তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনই এনে দিচ্ছি” বলিয়াই সে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং খানিক পরে গলির মোড়ের

কোন মনিহারীর দোকান হইতে একছড়া বেশ বড় দানাওয়ালা রঙচঙে পুঁতির মালা কিনিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে বারান্দার সেই মেয়েটীও উপর হইতে নামিয়া আসিয়া নীচে রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়াছে। পাঁচকড়িকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ পেয়েছি" বলিয়া পাঁচকড়ি তাহার ছেঁড়া মেরজাই-এর পকেট হইতে মালাছড়াটী বাহির করিয়া মেয়েটীর হাতে দিল।

মালা পাইয়া সে ভারি খুসি, মুখের কাছে হাতটা নাড়ানাড়ি করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "ক' পয়সা দাম ?"

"চার পয়সা।"

"চার পয়সা ? আমার কাছে যে মোটে দুটো পয়সা আছে ?" মেয়েটীর মুখখানা হঠাৎ এতটুকু হইয়া গিয়া চোখ দুটো ছল ছল করিয়া উঠিল।

তাহার সেই ভরসাহারা নিরাশ মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ তাচ্ছিল্য-ভাবে পাঁচকড়ি বলিল "থাকগে তোমার আর পয়সা দিতে হবে না।"

বিস্মিত কণ্ঠে মেয়েটী বলিল "দিতে হবে না ? ও, তুমি বুঝি ধার দাও ?"

"না, তোমার পুতুলের বিয়েতে মালাটা আমি এমনি দিয়ে

দিলুম।"

পাঁচকড়ির কথা শুনিয়া মেয়েটী বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ফেরিওয়ালা ফেরি করিতে আসিয়া কোন জিনিষ যে ক্রেতাকে বিনামূল্যে দান করিয়া যায় ইহা সম্ভবতঃ সে ধারণাই করিতে পারে না।

পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নামটী কি গা খুকী?"

নিজের সম্বন্ধে মেয়েটী সম্পূর্ণ অচেতন, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল "লীলা, আর আমার মেয়ের নাম কি জান চুড়িওলা?··· কাঁদুনী।"

মেয়ে বলিতে লীলা কাহার কথা বলিতেছে পাঁচকড়ি তাহা বুঝিতে পারিল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল "কাঁদুনী?······বাঃ বেশ নামটীত।"

হ্যাঁ ছেলে বেলায় বড্ড কাঁদত কিনা? তাই ওর ঠাকুরমা ঐ নাম রেখেছে।"

কি ভাবিয়া পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মেয়েটীকে একবার দেখাবে না লীলা?"

সোৎসাহে লীলা বলিল "দেখবে? দেখবে আমার মেয়েকে? দাঁড়াও তবে আনছি" বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া

বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই রঙ-বেরঙের কতক-গুলি টুকরো কাপড়ে জড়ান একটি আলুর পুতুল বুকে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্মিত-মুখে পাঁচকড়িকে বলিল "এটী আমার মেয়ে, এই বোশেখে তেরোয় পড়ল।"

পুতুলটার দিকে একবার তাকাইয়া সহাস্যে পাঁচকড়ি বলিল "বাঃ, তোমার মেয়েটী ত বেশ?"

প্রশংসা শুনিয়া লীলার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আদর করিয়া আঁচল দিয়া পুতুলের মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল "সারা দিন আজ উপোস কোরে থেকে মেয়ের আমার মুখখানা যেন কালীবর্ণ হয়ে গেছে। হাজার হলেও ছেলে মানুষ ত?

তাহার পাকাপানা কথা শুনিয়া পাঁচকড়ি আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। লীলা কিন্তু তখন নিজের কথাতেই সাতকাহন, কথায় কথায় বলিল "মানীর ছেলেটী বেশ, দুজনকে মানাবেও ভাল, তা ছাড়া ওরা কুলীনের ঘর...।"

ঠিক এই সময়ে বাড়ীর ভিতর হইতে আহ্বান আসিল "লীলা?"

"বাবা—বাবা, দুদণ্ড যদি কারো সঙ্গে গল্প করবার যো আছে" এই বলিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে লীলা পুতুলটাকে কোলে

করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

চুড়ির বাক্সটা মাথায় করিয়া পাঁচকড়ি আবার পথ চলিতে সুরু করে। পরের মেয়েকে দেখিয়া অবধি বার বার তাহার নিজের মেয়ে মাধবীর কথাই মনে হইতেছে। সেও দিবারাত্রি এইরূপ পুতুল খেলা লইয়া পড়িয়া থাকে। মাটীর পুতুলটাকে শতবার ঝাড়িয়া মুছিয়া, এগালে ওগালে বার বার চুম্বন করিয় কত রকম কথা বলিয়া আদর করে, সোহাগ করে। তাহারও পুতুলেরও বিবাহ হয়। উঠানের পেয়ারা তলাটায় ইটের খেলা-ঘর পাতিয়া ধূলোর ভাত আর ফুলের তরকারী রাঁধিয়া পাড়ার নিমন্ত্রিত সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সে যত্ন করিয়া খাওয়ায়। মাধবীর বড় সাধ একবার সে তাহার খেলাঘরের পুতুলের বিবাহে পাড়ার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারী খাওয়াইবে। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে পাঁচকড়ির মনটা এক এক সময় হঠাৎ তাহার সেই অবোধ মেয়েটার জন্য কেমন করিয়া ওঠে।

পরদিন দুপুর বেলায় পাঁচকড়িকে আবার সেই গলির মধ্যে দেখা গেল। লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয় অভ্যস্ত সুরে হাঁকিল "চাই, চুড়ি চাই"।

প্রথম ডাকে কেহ সাড়া দিল না। দ্বিতীয়বার ডাকিতেই

লীলা উপরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ হাসিয়া পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল লীলা মা ?",

ঘাড় নাড়িয়া লীলা জানাইল যে হ্যাঁ হইয়া গিয়াছে।

পাঁচকড়ি আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, লীলা বলিল "তুমি একটু দাঁড়াও চুড়িওলা, আমি আসি, "বলিয়াই সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল এবং খানিকপরে একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া পাঁচকড়িকে বলিল "একটু মিষ্টি খাও চুড়িওলা।"

বিস্মিত কণ্ঠে পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল "মিষ্টি···মিষ্টি কেন ?"

"বা—রে, কাল যে কাঁদুনীর বিয়ে হ'য়ে গেল, মনে নেই বুঝি ?"

"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ" বলিয়া পাঁচকড়ি হাসিমুখে মিষ্টিটা তুলিয়া লইয়া গালে ফেলিয়া দিল।

একথা সেকথা কহিতে কহিতে লীলা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কোথা, চুড়িওলা ?"

"সে অনেক দূর, পাড়াগাঁয়ে।"

"পাড়াগাঁ ? সে কোন্ দিকে ?"

পাঁচকড়ি তাহাকে বুঝাইয়া দিল, হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী

চাপিয়া ঘণ্টাচারেক গেলে বর্দ্ধমান পার হইয়া ছোট্ট এক ষ্টেশন, সেইখানে নামিয়া আরও ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া গেলে সরস্বতী নদীর ধারে তাহাদের বাড়ী।

পুতুলটাকে আদর করিতে করিতে লীলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "তোমার মেয়ে আছে চুড়িওলা ?"

ঘাড় নাড়িয়া পাঁচকড়ি বলিল "হ্যাঁ, তাকে দেখতে ঠিক তোমার মত, ঐ রকম মুখ, ঐ রকম চোখ ঠিক তোমার মত হাত নেড়ে নেড়ে কথা কয়...।" পাঁচকড়ির কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারি হইয়া উঠিল।

তাহার কথা শুনিয়া লীলা হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল "বা রে, বেশ ত ?"

আরও খানিক্ষণ গল্প গুজব করিবার পর লীলা বলিল "আচ্ছা আমি এবার যাই।"

"আচ্ছা মা এস" বলিয়া পাঁচকড়ি চুড়ির বাক্সটা মাথায় তুলিয়া আবার পথ চলিতে স্নুরু করিল।

তাহার পর প্রায়ই দুপুর বেলায় দেখা যাইত পাঁচকড়ি লীলাদের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া তাহার সহিত গল্প স্নুরু করিয়াছে। প্রতিদিনকার একঘেয়ে আনন্দহীন কেনাবেচার মধ্যে এই মেয়েটীর সহিত দুদণ্ড গল্প করিয়া পাঁচকড়ি কি আনন্দ

পাইত কে জানে ? তবে দেখা যাইত সারা দুপুরটা সে লীলাদের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিয়া কাটাইয়া দিতেছে। ভিন্ন পল্লীতে গিয়া ফেরি করিলে এই সময়টায় দু'পয়সা রোজগার হয় বটে, তবে এই মেয়েটীর মোহ তাহাকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে ইহার সহিত একবারটী দেখা না করিয়া গেলে তাহার মনে হইত সারাদিনটা যেন আজ বৃথাই গিয়াছে।

সেদিন মুর্গীহাটায় চুড়ি কিনিতে গিয়া পাঁচকড়ি দেখিল একটা মনিহারীর দোকানে সারি সারি কতকগুলি পুতুল সাজান রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার কি খেয়াল হইল সে বাছিয়া একটা পুতুল কিনিয়া চুড়ির বাক্সে পুরিল, পরে অন্য দোকান হইতে চুড়ি কিনিয়া ফেরি করিতে করিতে লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁক দিল "চাই, চুড়ি চাই।"

পাঁচকড়ির সাড়া পাইয়া লীলা উপরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। হাত নাড়িয়া তাহাকে ইসারা দিয়া জানাইল যে সে নীচে যাইতেছে।

পরক্ষণেই লীলা দুর্ দুর্ করিয়া নামিয়া আসিল।

জ্যৈষ্ঠমাস। দুপুর তখন চতুর্দ্দিকে রন্ রন্ করিতেছে। চুড়ির বাক্সটা কোলের কাছে নামাইয়া পাঁচকড়ি কোঁচার খুঁটে

বাতাস খাইতেছিল, লীলা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে সে হাতটা নামাইয়া হাসিমুখে বলিল "তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি লীলা মা।"

হাত বাড়াইয়া লীলা বলিল "কি দেখি ?"

পাঁচকড়ি তাহার বাক্স হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া লীলার হাতে তুলিয়া দিল। পুতুলটা লইয়া মুখের কাছে নাড়া চাড়া করিতে খুশির সুরে লীলা বলিল "পুতুলটা ত বেশ, তুমি বুঝি কিনে আনলে চুড়িওলা ?"

সত্য কথা বলিলে পাছে সে ইহা লইতে অস্বীকার করে এই ভয়ে পাঁচকড়ি বলিল, না, পুতুল সে কেনে নাই, মুর্গীহাটায় যাহার দোকান হইতে সে চুড়ি কেনে সেই দোকানদার জিনিষটা তাহাকে উপঢৌকন দিয়াছে।

লীলা আর কোন কথা বলিল না।

বেলা প্রায় গড়াইয়া আসিয়াছিল। আরও খানিক কথাবার্ত্তা কহিয়া পাঁচকড়ি তখনকার মত লীলার কাছে বিদায় লইল।

পরদিন যথা সময়ে তাহাকে আবার লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে দেখা গেল। লীলা সম্ভবতঃ তখন বৈঠকখানা ঘরেই ছিল। পাঁচকড়ির সাড়া পাইবামাত্র সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঈষৎ হাসিয়া পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল "কি গো মা, কি হচ্ছে ?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়া শুষ্ক মুখে লীলা প্রশ্ন করিল "মা জিজ্ঞাসা করেছে পুতুলের দাম কত ?"

পাঁচকড়ি যেন একটু থতমত খাইয়া গেল, আমতা আমতা করিয়া বলিল "পুতুল ? পুতুল ত আমি তোমায় অমনি দিয়েছি।"

মুখখানা আরও কাঁচু মাচু করিয়া লীলা জানাইল যে তাহার মা তাহাকে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়াছে যে সে যেন কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিষ বিনা মূল্যে না লয়।

অগত্যা পাঁচকড়িকে দামটা বলিতেই হল, নগদ সাড়ে চার আনা দিয়া কাল সে মুর্গীহাটা হইতে পুতুলটা খরিদ করিয়াছিল।

লীলা বলিল "তুমি একটু দাঁড়াও, মাকে আমি জিজ্ঞেস কোরে আসি।"

পাঁচকড়ি বলিল "আচ্ছা।"

পরক্ষণেই সে শুনিতে পাইল বাড়ীর ভিতরে লীলার মা লীলাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছে "যা ফেরৎ দিয়ে আয় গিয়ে, সাড়ে চার আনা দিয়ে আর পুতুল কেনে না।"

কথাটা শুনিয়া পাঁচকড়ি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত কি

ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ কি মতলব ঠাওরাইয়া সে চুড়ির বাক্সটা মাথায় করিয়া যথাসম্ভব দ্রুতপদে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

পরদিন আর তাহাকে লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে দেখা গেল না। তাহার পরের দিনও না।

তৃতীয় দিনে আবার দেখা গেল পাঁচকড়ি তাহার চুড়ির বাক্সটা মাথায় করিয়া ফেরি করিতে করিতে লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে এবং তাহার সাড়া পাইবামাত্র লীলাও প্রতিদিনের মত বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমত একটুখানি হাসিয়া পাঁচকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো মা, খবর সব ভাল?"

ঘাড় নাড়িয়া লীলা বলিল "হ্যাঁ।"

পাঁচকড়ি যেন আরও কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় লীলা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি দুদিন আসনি কেন চুড়িওলা?"

লীলার এই প্রশ্নে পাঁচকড়ির মনটা হঠাৎ খুশিতে ভরিয়া উঠিল। আত্মীয়-স্বজনহীন এই বিরাট কলিকাতা সহরে তবুও তাহার এমন একজন অনাত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, যে নাকি প্রতিদিনই তাহার দর্শন আশা করে। দুদিন না আসিলে কৈফিয়ৎ চায়, কেন সে এদিকে আসে নাই।

না আসিবার একটা মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া পাঁচকড়ি

বলিল "শরীরটা তেমন ভাল ছিল না কিনা মা, তার জন্যে দুদিন এদিকে আসতে পারিনি।"

"শরীর ভাল ছিল না? কি হ'য়েছিল···জ্বর নাকি···এখন সেরে গেছে?"

লীলার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা উদ্বেগ—কেমন একটা আকুলতা,—কতখানি টান থাকিলে মানুষ যে একজন অনাত্মীয়কে এমনি করিয়া প্রশ্ন করে, নিরক্ষর মূর্খ হ'লেও পাঁচকড়ি তাহা বোঝে, একটা হাই তুলিয়া সে ঈষৎ ঔদাস্যের সহিত বলিল "না জ্বর টর নয়···ও এমনি শরীরটা হঠাৎ কেমন খারাপ বোধ হচ্ছিল, এখন সব সেরে গেছে।"

লীলা যেন মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইল।

তাহার পর নানান্ কথা ও গল্প করিতে করিতে হঠাৎ একবার থামিয়া লীলা বলিল, "সে দিন তুমি পুতুলটা নিয়ে গেলে না চুড়িওলা, মা আমায় কত বকলে, বল্লে 'কেন তুই যার তার কাছে এমনি জিনিষ নিস?'

একটা ঢোক গিলিয়া পাঁচকড়ি বলিল "ও তাই নাকি? তা কি হ'য়েছে···নিলেই বা।"

"না চুড়িওলা, মা বকবে, তুমি একটু দাঁড়াও আমি পুতুলটা এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া লীলা চলিয়া যাইতেছিল, পাঁচকড়ি

তাহাকে বাধা দিয়া থামাইল। গলার স্বরটা একটু খাটো করিয়া বলিল "পুতুল আর দিতে হবে না, মাকে বরং বলো যে চুড়িওলার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।"

লীলা যেন কি বলিতে যাইতেছিল—এময় সময় বাড়ীর ভিতর হইতে আহ্বান আসিল "লীলা…"

কণ্ঠস্বরে পাঁচকড়ি চিনিতে পারিল লীলার মা।

লীলা চলিয়া গেলে নেপথ্যে দাঁড়াইয়া পাঁচকড়ি আরও শুনিতে পাইল লীলাকে ভৎর্সনা করিয়া মা বলিতেছেন "কোথা গিয়েছিলি? বাঁদর মেয়ের কেবল বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান।"

লীলা বলিল "বা রে বাইরে গেলুম কখন, আমি ত রোয়াকে ব'সে চুড়িওলার সঙ্গে গল্প করছিলুম।"

"ও, চুড়িওলা বুঝি তোমার ঘরের লোক? তোকে একদিন বোলেছি না হতভাগা মেয়ে, ওরা সব চোর ছ্যাঁচড়, দিনের বেলায় ফেরিওলা সেজে চুরির সন্ধান কোরে বেড়ায়, কথা গেরাহ্যি হয় না বুঝি?"

উত্তরে লীলা কি বলিল পাঁচকড়ি তাহা বুঝিতে পারিল না।

পরক্ষণেই সে শুনিতে পাইল লীলার মা লীলাকে জিজ্ঞাসা

করিতেছে "পুতুলটা ফেরৎ দিয়েছিলি ?...এ্যাঁ দিস্‌নি...যা আগে দিয়ে আয়,···যা বলছি।"

পাঁচকড়ি আর সেখানে বৃথা অপেক্ষা করিল না। চুড়ির বাক্সটা মাথায় করিয়া সে সেদিনকারের মত তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

তাহার পর, দিন আষ্টেক দশ আর তাহাকে লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে দেখা গেল না।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে বর্ষা নামিলে পাঁচকড়ি দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

কিন্তু যাইবার আগে একটীবার সে তাহার লীলা-মার সহিত দেখা না করিয়া কিছুতেই যাইতে পারিল না।

সে দিন রবিবার।

দুপুর তখন প্রায় গড়াইয়া আসিয়াছে। চুড়ির বাক্সটা মাথায় করিয়া পাঁচকড়ি লীলাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল "চাই চুড়ি-ই-ই।"

অন্যদিনের মত আজ আর কেহ তাহার সাড়া পাইবামাত্র দুড়দাড় করিয়া নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল না "ও চুড়িওলা, ক'দিন তুমি আসনি কেন ?"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া পাঁচকড়ি আবার হাঁক দিল

"চাই চুড়ি, ভাল ভাল রেশমী চুড়ি।"

দ্বিতীয় বার ডাকিতেই খুট করিয়া বৈঠকখানার দরজাটা খুলিয়া গেল। একজন কালো মত অপরিচিত লোক বাহিরে আসিয়া পাঁচকড়িকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

তাহার পর যাহা ঘটিল তাহা যেমন অপ্রকাশিত তেমনি বিস্ময়কর।

পাঁচকড়ি তাহার নিকটে গেলে লোকটি ফস করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া ঝাঁকানী দিয়া বলিল "শিগগির দুল বার কর।"

লোকটার এইরূপ অদ্ভুত ব্যবহারে পাঁচকড়ি প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, পরে আমতা আমতা করিয়া বলিল "দুল কি?"

"জান না, ন্যাকামী" বলিয়াই লোকটা হঠাৎ চটাস করিয়া পাঁচকড়ির গালে এক চড় বসাইয়া দিল।

দিবালোকে প্রকাশ্য পথের উপর লোকটা যে তাহাকে হঠাৎ মারিয়া বসিবে পাঁচকড়ি তাহা ভাবিতেও পারে নাই। সে প্রতিবাদ করিবার অবসর পাইল না। শুধু হাতটা গালে রগড়াইতে রগড়াইতে বিহ্বলের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া লোকটার মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

পথচারী দু-একজন লোক যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল তাহারা আগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, মশাই ?"

আস্ফালন করিয়া লোকটী বলিল "ব্যাটা পাকা চোর, ফেরিওলা সেজে চুরির সন্ধান কোরে বেড়ায়······আমার মেয়েটাকে পুঁতির মালা দিয়ে, পুতুল দিয়ে তাকে পটিয়ে পটিয়ে মশাই, ব্যাটা কিনা কখন একটা কানের দুল খুলে নিয়ে পালিয়েছে।"

কাহার কান হইতে কে দুল লইয়া পালাইয়াছে পাঁচকড়ি তাহা বুঝিয়াও ঠিক বুঝিকে পারিল না।

একজন বলিল "ব্যাটাকে পুলিসে দিন না ?"

অপরজন জামার হাতা গুটাইতে গুটাইতে আগাইয়া আসিয়া বলিল "পুলিসে দিয়ে কি হবে, তার চেয়ে বরং···" বলিয়াই সে হঠাৎ পাঁচকড়ির মুখের উপর এক ঘুঁসি মারিয়া বসিল।

ভাগ্যক্রমে ঘুঁসিটা নাকে না লাগিয়া পাঁচকড়ির কপালে লাগিয়াছিল তাই রক্ষা নচেৎ তখনই হয়ত তাহার নাক ফাঁটিয়া গল গল করিয়া রক্ত বাহির হইয়া যাইত। কপালেও যে কম লাগিল তা নয়, এক নিমিষে তাহার চোখের উপরটা আলুর মত

ট্যাব ট্যাবে হইয়া ফুলিয়া উঠিল।

পাঁচকড়ি বলিল "ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি দুলের কথা কিছু জানি না, বাবু।"

"না জান না" বলিয়া আবার একজন ঘুঁসি পাকাইতেছিল এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে লীলা ছুটিয়া আসিয়া বাপের একখানা হাত ধরিয়া বলিল 'না বাবা, ও দুল নেয় নি, ও চোর নয়, বাড়ীতে ওর আমার মত একজন মেয়ে আছে কিনা, তাই ও আমাকে..."

মুখ তুলিয়া পাঁচকড়ি চাহিয়া দেখে লীলার দুই চোখের কোণে অশ্রু যেন মুক্তার মত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

যাক্, অন্ততঃ লীলাও তাহা হইলে বিশ্বাস করে যে সে তাহার দুল লয় নাই। এত দুঃখেও ইহাই তাহার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

পরিশেষে, সর্ব্বক্ষেত্রে যাহা হয় এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। খুব খানিকটা মারধোর করিয়া, চুড়ির বাক্সটা কাড়িয়া লইয়া পাঁচকড়িকে তাহারা ছাড়িয়া দিল।

পথে আসিতে আসিতে কি ভাবিয়া পাঁচকড়ি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিকে চাহিয়া লীলা তখনও রোয়াকের নীচে চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পাঁচকড়ি মুখ ফিরাইয়া তাকাইতেই সে সুট করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

শিরীষ ফুল

বিবাহের পর থেকেই অনেকদিন ধরিয়া একটানা একত্র-বাস,—এ সৌভাগ্য হয়ত অনেকেরই হয়না।

মহিম আর পার্ব্বতী।

প্রায় বৎসর খানেক হইল এই মাণিক জোড়টি বাংলার এক নিভৃত পল্লী-প্রান্তর হইতে এই কয়লা কুটোর দেশে আসিয়া গৃহস্থালী পাতিয়াছে। এখানকার একটা কলিয়ারীতে মহিম চাকরী করে।

বিবাহের পর পার্ব্বতী প্রায় মাসখানেক বাপের বাড়ীতেই ছিল, আরও হয়ত কিছুদিন থাকিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন মহিম আসিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, যখন পার্ব্বতীর দিক থেকে আপত্তির পরিবর্ত্তে যাইবার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন উৎসাহ দেখা দিল তখন আর তাহাকে না পাঠাইয়া থাকা যায় না। পাড়ার বর্ষিয়সী মহিলারা, যাহারা কত শত দেখিয়া চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারা সবাই বলিলেন,

'এ কালের মেয়েগুলো সব কি বেহায়া, দু'দিন আর তর্ সয় না।'

পায়রার খোপের মত ছোট্ট গৃহখানি, তাহারই ভিতরে সহস্র ক্ষুদ্র ও বৈচিত্র্যহীন ঘটনা লইয়া কোন রকমে দিনের পর দিন কাটাইয়া দেওয়া—শতকরা নিরানব্বই জন কেরাণীর ইহাই জীবন-ইতিহাস।

কিন্তু তবুও এই দম্পতীটীর জীবন একেবারে প্যান্‌সে নয়। প্রত্যহ ভোর পাঁচটার সময় যখন সাঁওতালী কুলীরা মেয়ে পুরুষ মিলিয়া গান গাহিতে গাহিতে কাজে যায়, ঠিক সেই সময়ে পার্ব্বতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। চোখ খুলিয়াই আগে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখে। মহিম হয়ত তখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছে। আবার এক একদিন হয়ত হাতের নীচে পার্ব্বতীর শাড়ীর আঁচল চাপিয়া রাখিয়া মটকা মারিয়া পড়িয়া থাকে। প্রথম প্রথম পার্ব্বতী কত মিনতি করে 'আঃ ছাড় লক্ষ্মীটী, বেলা হয়ে গেছে।' মহিম আরও জোর করিয়া নাক ডাকায়। পার্ব্বতী তাহার গায়ে শুড়-শুড়ি দেয়, চিম্‌টী কাটে। মহিম তাহাতে একটু নড়িয়া কাপড়ের আঁচলটা হাতের মুঠোয় আরও শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে। অনন্যোপায় না দেখিয়া পার্ব্বতী হাতটা কট্ করিয়া কামড়াইয়া লয়। হাতের মুঠোটা খুলিয়া যায়, পার্ব্বতী

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ছুটিয়া পালায়। প্রত্যহ সকালে এমনিতর একটা না একটা কিছু মহিমের অবসন্ন দেহ-মনকে নাড়া দিয়া একটু চাঙ্গা করিয়া দেয়।

আফিসে যাইবার সময় পার্ব্বতী আসিয়া দাঁড়ায় জানালার ধারে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া মহিম পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া একটু-খানি হাসে। পার্ব্বতীও হাসিয়া সরিয়া যায়। সারাদিন আফিসের কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে পার্ব্বতীর এই হাসি মুখখানা মহিমের মনের আড়ালে আবডালে কেবলই উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে। কাজ করিতে করিতে মহিম বার বার দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায়। ঘড়িটাই যেন তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার অগ্রদূত।

বৈকালে আফিস হইতে ফিরিবার সময় মহিম দেখে পার্ব্বতী জানালার ধারে দুই গরাদের ফাঁকে মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকাল বেলাকার সেই দুষ্টুমী-ভরা হাসি মুখ আর নাই। সুচারু দুইটী পদ্ম-চক্ষুর উদ্গ্রীব দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সম্মুখের পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর ভিতরের রোয়াকটার উপর বসিয়া পার্ব্বতীর হাতের বাতাস খাইতে খাইতে সে ভাবে আজ যদি এ না থাকিত তাহা হইলে এ পৃথিবীতে তাহার বাঁচিয়া থাকা হয়ত দুরূহ হইয়া উঠিত।

আফিসের সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যা বেলায় ঘরের কোণে পার্ব্বতীর এই হাসি মুখখানা তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের সকল দুঃখকে ভুলাইয়া রাখে। পার্ব্বতীরই বুকের স্নেহ আর মুখের হাসি তাহাকে এই পৃথিবীতে বাস করিবার জন্য ঐন্দ্রজালিক আশ্রয় গড়িয়া দিয়াছে। এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে এক এক সময় সে পার্ব্বতীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকে। লক্ষ্মীর মত মহিমাময়ী তাহার দুঃখিনী স্ত্রী পার্ব্বতী।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর উঠানে মাদুর বিছাইয়া তাহারা দুটীতে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ অবধি গল্প করে। মাথার উপর শান্ত রাত্রির তারা-ভরা নীলাকাশ। তাহার গায়ে শাদা কালো পেঁশুটে নানা ধরণের নানা বর্ণের মেঘ হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়।

পার্ব্বতী বলে 'কি চমৎকার দেখাচ্ছে দেখ!'

মহিম চাঁদের দিকে চাহিয়া হাতছানি দিয়া বলে 'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, পারুর কপালে টি দিয়ে যা।' এই বলিয়া মহিম পার্ব্বতীর দুই ভ্রূর মাঝে আঙ্গুল দিয়া টিপ দেয়।

পার্ব্বতী বলে 'আমি কি কচি খুকি নাকি?'

'না তুমি ষাট বছরের বুড়ী।'

'ওমা সে কি গো আমার যে এখনও কুড়ী পেরুতে তিন

বছর দেরী আছে, আর তুমি আমায় বল্লে কিনা ষাট বছরের বুড়ো।' এই বলিয়া পার্ব্বতী অনর্থক একটুখানি হাসিয়া ফেলে। হাসিলে তাহাকে চমৎকার মানায়, চোখের কোলে কেমন একটা খাঁজ পড়ে।

একদিন শনিবারে আফিস হইতে ফিরিয়া মহিম বলে 'চল পার্ব্বতী, কাল আমরা নীল পাহাড়ে বেড়াতে যাই, শুনেছি ভারি চমৎকার যায়গা, একটা ঝরণাও আছে। কিছু খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে।

খুসির সঙ্গে পার্ব্বতী রাজি হয়, বলে, 'খাবার দাবার কেন? চাল, ডাল, সঙ্গে কোরে নিয়ে গিয়ে সেইখানে চড়ুইভাতি কোরে খাওয়া যাবে'খন। মহিম বলে 'হেঁ, হেঁ, সেই বেশ।'

পরের দিন সকাল বেলায় মহিম ঘুম হইতে উঠিয়াই একখানা দুই চাকা গরুর গাড়ী ডাকিয়া লইয়া আসে। চাল ডাল মসলা পাতির পুঁটুলী বাঁধিয়া তাহারা গাড়ীতে চড়িয়া বসে।

চলিতে চলিতে মাঝ-রাস্তায় গিয়া মহিম গান ধরে। হাসিয়া পার্ব্বতী বলে 'কি যে ছেলেমানুষি কর।'

বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়া ধরিয়া মহিম বলে 'তুমিও গাও না পার্ব্বতী।' হাতখানা সরাইয়া দিয়া পার্ব্বতী

বলে 'যাও গাড়ায়ানটা রয়েছে বেহায়াপনা করতে লজ্জা করে না ?'

মহিম পার্ব্বতীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া গান ধরে—

অন্ধকারে হারিয়ে গেছি তাইতে মরি ডরে;
চলো তুমি সঙ্গে আমার সেই অচেনা ঘরে।

স্বামীর এই সব ছেলে মানুষি, খাম খেয়ালী পার্ব্বতীর ভারি ভাল লাগে। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কেবলই স্বামীর মুখের পানে তাকায়, চোখাচোখি হইয়া পড়িলে মুচকে একটু হাসিয়া ফেলে।

:

পাহাড় দেখিয়া পার্ব্বতী খুব খুসী। একটা পাথরের উপর দুজনে পাশাপাশি বসিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। বিশ্বদেব যেন তাহার অক্ষয় সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার উজাড় করিয়া প্রকৃতি দেবীকে নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছেন। শন শন করিয়া এক ঝলক এড়ো হাওয়া শাল ও মহুয়ার ডাল পালা দোলাইয়া বহিয়া যায়। পার্ব্বতীর সাড়ীর আঁচল বিক্ষিপ্ত চূর্ণালোক মহিমের মুখে চোখে উড়িয়া পড়ে। গভীর তৃপ্তিতে মহিমের দেহ মন অসাড় হইয়া পড়ে। কহিবার মত কোন কথা আর মনে আসে না। মহিমের গায়ে একটা ঠেলা দিয়া পার্ব্বতী বলে, 'যাওনা চান করে এসনা।'

আব্দারের সুরে মহিম বলে 'দুজনে একসঙ্গে চান করব ভাই পার্ব্বতী।'

'ওমা আমি কি লজ্জা ঘেন্নার মাথা খেয়েছি নাকি ?'

পার্ব্বতীর কাঁধে ভর দিয়া মহিম বলে, 'লজ্জা আবার কি ?'

'যদি কেউ ফস্ কোরে এসে পড়ে ?'

'হেঃ, তুমিও যেমন, এখানে কারও আসবার জন্যে বয়ে গেছে।' মহিম নাছোড়বান্দা হইয়া ওঠে, অবশেষে পার্ব্বতীর হাত ধরিয়া টানাটানি করে।

পার্ব্বতী বলে 'আমি চান্ কোরব না, ও ঝরণার জলে চান্ করলে আমার অসুখ করবে।'

অভিমান ভরে মহিম বলে 'তবে আমিও চান্ কোরব না, আমারও অসুখ কোরবে।'

পার্ব্বতী হাসিয়া ফেলে, বলে 'খুব হ'য়েছে চল, কথা ত আর শুনবে না।'

পার্ব্বতীর নাকের প্রান্তভাগটা ধরিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া বলে 'খুব শুনবো, ওগো খুব শুনবো, এখন চল দেখি।'

স্নান করিবার সময় মহিমের ছেলেমানুষির আর অন্ত থাকে না। কখনও বা পার্ব্বতীর চোচে মুখে জল ছিটাইয়া দেয়,

কখনও বা বলে 'পার্ব্বতী আমার পিঠটা একটু রগড়ে দাও না ভাই।' এমনিতর আরও কত কি। পার্ব্বতী অস্থির হইয়া ওঠে। অবশেষে মহিমের কবল হইতে কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করিয়া ছুটিয়া পালায়।

উনুন ধরাইবার সময় সে আর এক মুস্কিল। একটা শিরীষ গাছের ছায়ায় তিন খানা পাথর দিয়া পার্ব্বতী উনুন তৈয়ারী করিয়াছে, ভিজে কাঠ কিছুতেই ধরিতে চায় না, ধোঁয়ায় পার্ব্বতীর মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠে।

মহিম তাহার সেই টুক্‌টুকে রাঙা মুখখানির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। এতদিন সে কত রকমে পার্ব্বতীকে দেখিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজিকার এই রক্তবর্ণের সাড়ী সুশোভিতা, মুক্ত উদার আকাশের তলে রন্ধন-রত হাস্যময়ী, মল্লীকালতার মত ব্রীড়াময়ী পার্ব্বতীকে সে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

পার্ব্বতীর পাশে উপবেশন করিয়া মহিম বলে 'আচ্ছা, আমি একটু দেখি।'

পার্ব্বতী বলে 'আর থাক, বীরত্বের কাজ নেই।'

কিন্তু মহিম দু'চারবার জোরে ফুঁ দিতেই দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে। মহিম বলে 'কেমন, হলো ত? তখন যে ভারি ইয়ে করছিলে।'

গম্ভীর মুখে পার্ব্বতী বলে 'বেশ খুব বীর' :

মহিম বলে 'পার্ব্বতী তোমায় আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, একটা টিপ পরবে রাণী ?'

হাসিয়া পার্ব্বতী বলে 'ওমা টিপ এখানে কোথা পাব ?'

'আমার কাছেই আছে।'

'কই দেখি ?'

মহিম তাহার ফাউণ্টেন পেনের এক ফোঁটা কালী আঙ্গুলের ডগায় লাগাইয়া লইয়া জোর করিয়া পার্ব্বতীর দুই ভ্রুর মাঝখানে ছোট্ট একটা টিপ দিয়া দেয়। পার্ব্বতী মুছিয়া ফেলিতে যায়, তাহার হাতখানা ধরিয়া মিনতি করিয়া মহিম বলে 'লক্ষ্মীটী পার্ব্বতী, মুছো না, তোমায় বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু।'

খেয়ালের মাথায় পার্ব্বতী বলিয়া ফেলে, 'তোমার পাল্লায় পড়ে জীবনটা আমার গেল।'

মহিমের বুকের ভিতরটা ছেঁৎ করিয়া ওঠে। পার্ব্বতীর মুখের এই একটা কথায় আজকের এই আনন্দটা যেন একেবারে মাটী হইয়া যায়। শুধু আজকের নয় কথাটা যদি পার্ব্বতীর মনের কথাই হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়েরই সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের সকল সম্বন্ধের এইখানেই পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে। একটা পাথরের উপর অল্প সময়ের মধ্যেই সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া যায়।

সম্মুখে পার্ব্বতী আসিয়া দাঁড়ায় বলে 'কি ভাবচ ?'

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মহিম বলে 'পার্ব্বতী একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক উত্তর দেবে ?'

পার্ব্বতী খপ্ করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া বলে 'আমার অন্যায় হয়েছে, আগু পিছু না ভেবে, ফস্ কোরে কথাটা বলে ফেলেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।'

মহিম তাহার সেই বাষ্পোচ্ছ্বাসিত মুখখানির দিকে একবার তাকায়. তাহার পর বলে 'ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে।'

উদ্বিগ্নকণ্ঠে পার্ব্বতী শুধায়, 'কি ?'

'আজ আমরা এখানে দু'জনে একপাতে বসে খাব।'

গালে হাত দিয়া পার্ব্বতী বলে 'ওমা কি হবে তাতে যে আমার পাপ হবে গো।'

'তা হোক।'

খাওয়া দাওয়ার পর বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমশঃ অপরাহ্ন গড়াইয়া আসে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়ায়। পার্ব্বতী বলে 'লোকে তীর্থ করতে গিয়ে মন্দিরের গায়ে নিজেদের নাম লিখে রেখে আসে, এস আমরা ঐ শিরীষ গাছটার গায়ে আমাদের নামটা লিখে দিই।'

হাসিয়া মহিম বলে 'বেশ, বেশ, আমার নামটা তুমিই লিখে দাও।'

শিরীষ গাছটার গায়ে ছুরী দিয়া পার্ব্বতী লিখিয়া রাখে 'মহিম-পার্ব্বতী'। পাশে দাঁড়াইয়া মহিম একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সেই লিখন-রত মুখখানির পানে চাহিয়া থাকে। পার্ব্বতীর ঘাড় নাড়িবার ভঙ্গীটা অতি অপরূপ, কোন সুন্দরী সুচারু-নেত্রা ধনী বধূর মত কেমন একটু আভিজাত্য মেশান।

দৈনন্দিন এমনিতর কত শত তুচ্ছ ও বৈচিত্র্যহীন ঘটনা লইয়া দিনের পর দিন তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। একদিন তাহাদের দু'জনার সংসারে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন সম্ভাবনা দেখা দেয়। অজানা পুলকে তাহাদের অবচেতন দেহমন প্রতি মুহূর্ত্তে শিহরিয়া ওঠে। কথায় কথায় মহিম একদিন বলে, 'পার্ব্বতী তোমার দাদাকে না হয় লিখে দিই একদিন এসে তোমায় নিয়ে যাক্, এ সময়টায় মায়ের কাছে থাকাই ভাল।'

একটু ভাবিয়া পার্ব্বতী বলে 'এখনও ত দেরী আছে।'

মহিম বলে 'না না এই প্রথম, একটু সাবধানের দরকার; এই সময়েই যাওয়া ভাল।'

পরদিন মহিম সম্বন্ধীকে লিখিয়া দেয় সময় মত একদিন আসিয়া পার্ব্বতীকে লইয়া যাইতে, তাহার ছুটী নাই সে যাইতে পারিবে না।

তারপর একদিন এক কুহেলী-ঘেরা অপরাহ্ন বেলায় লুকাইয়া রাখা চোখের জলে পার্ব্বতী বিদায় লয়। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া চলন্ত গাড়ীর উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে তাহার সেই ঘোমটায় ঢাকা লজ্জানতা মুখখানি দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ দূরে বহু দূরে মিলাইয়া যায়। একটা লাইট পোষ্টের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া মহিম ট্রেণের শেষ শব্দটী পর্য্যন্ত কাণ পাতিয়া শোনে। তাহার পর মনটাকে একবার জোরে ঝাঁকানি দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ লয়।

পথে আসিতে আসিতে পার্ব্বতীর কত কথাই না মনে পড়ে। যাইবার সময় পর্য্যন্ত পার্ব্বতী বিজ্ঞের মত উপদেশ দিয়া গিয়াছে 'হাত পুড়িয়ে না রেঁধে মেসেই যেন খাওয়া হয়, গয়লাকে যেন ছাড়িয়ে দিও না, দুধটা নিজের জন্যে রেখো. অন্য অনেক খরচ ত কমলো এখন' ইত্যাদি। অবশেষে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল 'আমার জন্য দিনরাত ভেবে মিছে মন খারাপ করো না।'

রাত্রে তাহারই নিভৃত রচিত শূন্য শয্যায় শুইয়া শুইয়া মহিম ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। এখানে আসিয়া অবধি একটী দিনের তরেও শয্যার যে অংশটা শূন্য পড়িয়া থাকে নাই। আজ সেই শূন্য স্থানটার দিকে একটী বার চাহিয়াই তাহার

বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করিয়া উঠে। পার্ব্বতীর মাথার বালিসটা থেকে একটা তেতো গন্ধ ভাসিয়া আসে। ঠিক এই ধরণের গন্ধ প্রত্যহ সে পাইত পার্ব্বতীর চুলে। আলোটা নিভাইয়া দিয়া অন্ধকার ঘরের বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিয়া সে ভাবে পার্ব্বতী যেন তাহারই পাশে শুইয়া আছে, এখনই ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরিয়া শুইবে।

বৈকালে অাফিস হইতে ফিরিয়া সে শূন্য দৃষ্টিতে জানালার পানে তাকাইয়া থাকে। প্রত্যহ ঠিক এই সময়টাকে পার্ব্বতী এই শূণ্য জানালাটার ধারে দাঁড়াইয়া অধীর ভাবে অপেক্ষা করিত তাহার জন্য।

এই রকম সকল ছোট খাটো শূন্যগুলি মিলিয়া তাহার মনে এক বিরাট মহাশূন্যের সৃষ্টি করে।

পার্ব্বতী চিঠি লেখে 'বাবা মার ভারি ইচ্ছে তোমায় দেখতে, এখানে এসনা একবারটী। বকুল ফুলকে মনে পড়ে? তার বরের সঙ্গে আলাপ হলো, ভারি চমৎকার লোক। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আবার এখানে আসবে। আমায় অনেক করে বলে গেছে, তোমায়ও ঐ সময় আসবার জন্যে লিখতে, আসবে ঐ সময় লক্ষীটি?'

মহিমের মনে নিষ্ফল অভিমান গর্জ্জিয়া ওঠে। এঁ দেখতে

চেয়েছে, ও আসতে বলেছে, তাই লেখা হ'য়েছে। তবুও লিখতে পারলে না তার নিজের একবার দেখতে ইচ্ছে হয়; মেয়ে মানুষগুলোর মনই ঐ রকম, একবার চোখের আড়ালে গেলে সব ভুলে যায়।

উত্তরে মহিম লিখিয়া দেয়, ঐ সময়ে তাহার ওখানে যাওয়া অসম্ভব। অনেক দিন দেশে যাওয়া হয় নাই, সেখানে একবার যাইতেই হইবে। পরক্ষণেই মনে মনে ফন্দি আঁটে জন্মাষ্টমীর ছুটীতে হঠাৎ পার্ব্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিবে।

কিন্তু দুরদৃষ্ট তাহার. সত্যই সেই সময়ে যাওয়া তাহার ঘটিয়া ওঠে না। কয়লার মত কঠিন প্রাণ আফিসের মনিব, স্বদম্ভে জানাইয়া দেয় অতিরিক্ত কাজের চাপ পড়ায় জন্মাষ্টমীর ছুটীতে তাহাদের কাজ করিতে হইবে। পরে পূজার ছুটীর সহিত তাহাদের ঐ পাওনা ছুটী যোগ করিয়া দেওয়া হইবে।

কোন উপায় নাই; বিধাতার মত অন্নদাতা মনিব. তাঁহার আদেশের প্রতিবাদ করা আর উন্মাদ পতঙ্গের মত জ্বলন্ত দীপশিখার পাশে পুড়িয়া মরিবার বাসনায় ছটফট করা দুই সমান।

পার্ব্বতীকে একবার দেখিবার জন্য তাহার মনটা অস্থির

হইয়া ওঠে। পূজার ছুটীর এখনও অনেক দেরী। শনিবারও যাইবার উপায় নাই। সেদিনও অন্যদিনের মত সন্ধ্যাপর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। রবিবার সকালে গিয়া সোমবরের সকালে ফিরিয়া আসা অসম্ভব। অথচ একদিন আফিস কামাই হইলে আবার চাকরী লইয়া টানাটানি হইবার ভয় আছে। এমনি পোড়া কপাল। সাঁওতালী কুলীগুলোকে দেখিয়া মহিমের মনে হয় যে যদি ইহাদেরই মত একটা কুলী হইত তাহা হইলে ~~করত~~ চাকুরীর মায়া কাটাইতে পারিত। ইহারা তাহাদের মত অভাগা কেরাণীগুলোর চেয়ে ঢের সুখী।

দু মাস, তিনমাস, চার মাস কাটিয়া যায়।

পার্ব্বতীর চিঠি আসে, 'ওগো আমি তোমার কাছে এখন কি অপরাধ কোরেছি, যার জন্যে তুমি আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে রেখেছ। আমায় কি একটি বারও দেখতে তোমার সাধ হয়না?' অতি কষ্টে মহিম জবাব দেয় 'তুমি অতটা অধীর হয়ো না পার্ব্বতী, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, যাতে শীঘ্র একবার তোমায় দেখে আসতে পারি'

আবার চিঠি আসে 'আমার শরীরটা বড্ড খারাপ এ-দিকে সময়ও প্রায় হ'য়ে এল, তুমি যত শীঘ্র পার এস একবার।' মহিম পুনরায় ছুটীর জন্য; দরখাস্ত করে। ছুটী মঞ্জর হয়,

তবে দু সপ্তাহ পরে তিন দিনের জন্য তাহাতেই মহিম খুসি, এতদিন যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন আর দু সপ্তাহ কাটিতে বেশী সময় লাগিবে না।

সে অধীর ভাবে নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করে।

সপ্তাহ খানেক পরে একদিন দুপুর বেলায় মহিম আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছে এমন সময় খাকী পোষাক পরা টেলিগ্রাম পিওন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়। মহিমের মাথাটা যেন ঘুরিয়া পড়ে। পায়ের তলার মাটীটা যেন কাঁপিতে থাকে কোন রকমে রসিদখানা সহি করি। দিয়া কম্পিত হস্তে খামখানা ছিঁড়িয়া টেলিগ্রামটা পড়িয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ওঠে। তাহার সম্বন্ধী তাহাকে তার করিয়া জানাইতেছে 'পার্ব্বতী একটী হৃষ্টপুষ্ট সন্তান প্রসব করিয়াছে।' 'পিওনটা'ই এ সুসংবাদটা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাকে ডাকিয়া খেয়ালী মহিম পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া সম্মুখে ফেলিয়া দেয়! তাহার পর ঝোঁকের মাথায় একখানা টেলিগ্রাম ফর্ম্ম লইয়া নবকুমারকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে বসে।

আফিসের সবাই খাওয়াইবার জন্য ধরিয়া বসে। মহিম পকেট হইতে একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির করিয়া খুসির সহিত তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দেয় ফিরিয়া আসিয়া

পার্ব্বতীকে চিঠি লিখিতে বসে। পাতার পর পাতা লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ সাত আট পাতা হইয়া যায় তবুও তাহার লেখা শেষ হয় না। পরদিন অফিসে গিয়াই চিঠিখানা ডাকে পাঠাইয়া দেয়।

বৈকাল বেলায় সবেমাত্র সে আফিস হইতে বাহির হইতেছে-এমন সময় আরজেণ্ট টেলিগ্রাম পিওন আর একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে হাজির হয়। উদ্বিগ্ন চিত্তে টেলি-গ্রামখানা খুলিয়া কাগজ খানা পড়িয়া তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে থাকে। সম্বন্ধী টেলিগ্রাম করিয়াছে 'পার্ব্বতীর অবস্থা খুব খারাপ, শীঘ্র এস।'

মহিম মরিয়া হইয়া ওঠে। তৎক্ষণাৎ সে টেলিগ্রাম খানা ম্যানেজারকে দেখাইয়া ছুটী লইয়া শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়ে।

পরদিন সকাল বেলায় যখন সে শশুর বাড়ীতে পৌছিল তখন দশটা প্রায় বাজে বাজে। দূর হইতে নিস্তব্ধ বাড়ীখানাকে দেখিয়া মহিম ভাবে হয়ত পার্ব্বতী একটু ভাল আছে তাই সব চুপ চাপ।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকিতেই শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়াই চীৎকার

করিয়া ওঠে 'কি দেখতে এলিরে বাবা, আমার ঘরের লক্ষ্মীকে এই যে তারা নিয়ে চলে গেল।

পার্ব্বতী নাই। যে পার্ব্বতী এতদিন তাহার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মিশিয়াছিল, এই সেদিনও যে তাহাকে আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিল, সেই পার্ব্বতী আজ আর নাই। ঘরের কোণের মাকড়সার জালের মত কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। মরিবার সময় পর্য্যন্তও হয়ত সে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছে শুধু একটিবার তাহাকে চোখের দেখা দেখিবার জন্য। অস্থির হইয়া সে ছুটিয়া যায় শ্মশান ঘাটের দিকে।

গ্রামপ্রান্তে নদীতট আলোকিত করিয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলে পার্ব্বতীর চিতা। দেখিতে দেখিতে পার্ব্বতীর সেই যৌবনপুষ্পিত অতনুতরুণ-অনবদ্য-দেহ, আলুলায়িত কৃষ্ণ-কুন্তজাল, আরক্তিম দুইটী ওষ্ঠপুট, দুইটী সুচারুচক্ষু, সিমন্তের সিঁদুর, এয়তির চিহ্ন সব কিছুই একটু একটু করিয়া পড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

জ্বলন্ত চিতার পাশে বসিয়া মহিম সজল নয়নে পার্ব্বতীর এই লোকান্তরের যাত্রাপথের শেষ পাথেয় অঞ্জলী ভরিয়া ঢালিয়া দেয়।

আবার দিনের পরদিন যায়। সংস্থান করিবার জন্য নয়,

বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে আবার চাকরী করিতে হয়। বন্ধু বান্ধবেরা উপদেশ দেয় বে'থা করিয়া আবার সংসারী হইতে। সংসারী হয়ত সে ইচ্ছা করিলেই হইতে পারে। পার্ব্বতীরই মত আর একজন আসিয়া হয়ত আবার তাহার গৃহস্থালী গুছাইয়া দিতে পারে। কিন্তু সংসারী হওয়ার সে প্রবৃত্তি আর তাহার হয় না। স্মৃতির পটে ভাসিয়া ওঠে বড় প্রিয় এক করুণার অস্পষ্ট ছবি, আশায় নিরাশায় গাঁথা জীবনের অধীত ...দিনের পদ্য কাহিনী।

খোকার কথা মনে পড়ে। পার্ব্বতীর অকাল মৃত্যুর জন্য সবাই খোকাকে দায়ী করে। কিন্তু সেত আর যাচিয়া আসে নাই। পার্ব্বতী আর মহিম তাহারা দুজনে মিলিয়াই যে খোকাকে কোনরূপকথার দেশ থেকে ধরিয়া আনিয়াছে। খোকা বড় হোক তাহাকে সে নিজের কাছে আনিয়া রাখিবে।

বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন সে নীলপাহাড়ের দিকে যায়। বহু দিনের বিস্মৃতপ্রায় একটা চিরমধুর স্মৃতি শাল ও মহুয়া বনের অন্তরাল হইতে অস্ফুট ছায়ারূপে দেখা দিয়ে যায় ঝরণার জল পূর্ব্বের মত উপর হইতে নীচের দিকে গড়াইয়া আসিতেছে। শিরীষ-গাছটার নীচে পার্ব্বতীর হাতের উনুনটা এখনও পাতা রহিয়াছে। পার্ব্বতী একদিন এইখানে কয়েক

ঘণ্টার জন্য ঘরকন্না পাতিয়াছিল। মহিম ধীরে ধীরে সেইখানে গিয়া দাঁড়ায়। শিরীষ গাছটার ডালে ডালে ফিরোজা রঙের ফুল ফুটিয়াছে। সে দিকে চাহিতে চাহিতে হঠাৎ চোখ পরিয়া যায় গাছটার গায়ে, পার্ব্বতীর হাতের লেখা তাহাদের নামটা তখনও সেখানে লেখা রহিয়াছে। মহিম একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া থাকে। ঐ অক্ষর-গুলোর পিছন হইতে শিরীষ ফুলের পাপড়ীর মত-একখানা নরম ও কচিমুখ এই নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তরে তাহাকে একাকী পাইয়া স্মিতহাস্যে বার বার যেন ইঙ্গিত করিয়া যায়।

পার্ব্বতী আজ ঐ আকাশটার মত বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন হয়ত তাহারই সেই স্নেহ প্রেমে গড়া লীলাময়ী পার্ব্বতী এত দিনে কাহারও ঘরে ছোট খুকিটী হইয়া আবার জন্ম লইয়াছে কিন্তু গাছের গায়ে ঐ লেখা নামটার মত এমনিতর কতশত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ স্মৃতিকণা মহিমের মনে যুগ যুগ করিয়া অক্ষয় হইয়া থাকে।

—শেষ—